অক্টোবর ২০১৭ □ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৪

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নেপালের উজালি ও বাংলাদেশের রাসেল

শিশুদের অধিকার ও বিশ্ব শিশু দিবস

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়
লেখা পাঠাও গ্রাহক হও

নবারুণ-এর চাঁদা বার্ষিক ২৪০.০০ টাকা
ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

- গ্রাহকগণ পত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বর বা গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করবেন। বছরের যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী সংখ্যা থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাকযোগে পাঠানো হয়।

- নবারুণ পত্রিকার সাথে যুক্ত হতে ফেইসবুকে লগ ইন করো Nobarun Potrika নামে। বন্ধু হও নবারুণ-এর।
আর হ্যাঁ, ই-মেইলে লেখা পাঠাতে চাইলে SutonnyMJ ফন্টে পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়:
editornobarun@dfp.gov.bd

এজেন্টদের কপি ভি,পি, যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।
এজেন্টদের কমিশন শতকরা ৩৩% হারে দেওয়া হয়।
এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বন্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি দেখুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ :dfpsb@yahoo.com • নবারুণ: editornobarun@dfp.gov.bd • বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি: bdqtrly@gmail.com

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

অক্টোবর ২০১৭ ■ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৪

সৌজন্য সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

শিল্প নির্দেশনা
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ :
সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : বিশ্ব প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকের কথা

বিশ্ব শিশু দিবস-এর শুভেচ্ছা রইল সব বন্ধুদের জন্য। সব বন্ধু মানে, সব বন্ধু। ছটফটে হও বা চুপচাপ হও, চুলে দুই বেণি করো আর চুল নেই মাথা নিয়ে একগাল হাসি দাও, দাঁত দু'একটা পড়ে গেছে কি পড়েনি একটাও, ইশকুলে পড়ো বা এখনো পড়া শুরু করোনি, সব বন্ধুদের ভালোবাসি। এমনকি বিশেষ শিশু বলে অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে আমাদের মাঝে এসেছে যে বন্ধুরা, শুভেচ্ছা তাদেরকেও। হাত বাড়িয়ে দাও বন্ধুরা। বলো, ভালোবাসি! ভালোবাসার শক্তিতে শক্তিমান হও তোমরা।

এ সংখ্যায় যা থাকছে

নিবন্ধ

০৩ নেপালের উজালি ও বাংলাদেশের রাসেল
সেলিনা হোসেন
০৮ ব্রহ্মপুত্রের পৃথিবী ভ্রমণ/মীম নোশিন নাওয়াল খান
১২ শিশুদের অধিকার ও বিশ্ব শিশু দিবস/শাহানা আফরোজ
৩২ সিঙ্গাপুরে ছোটোদের উৎসবে/আশিক মুস্তাফা
৪৮ গাছগুলো সব অদ্ভুত/নাবীল অনুসূর্য
৫১ আমি কেন অংক করতে ভয় পেতাম না, জানো?
বি.এম গোলাম কিবরিয়া
৫৫ হেমন্ত এল, এল রে!/ফরিদ আহমেদ হৃদয়
৫৬ ভোর আকাশের তারা/সানাউল্লাহ আল মুবীন

নাটক

১৯ হাসি/কুমার প্রীতীশ বল

গল্প

৩৭ নিপুর রঙিন একদিন/নিশাত সুলতানা
৪০ নিমুর গল্প/চন্দনকৃষ্ণ পাল
৪৬ বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলা/রণজিৎ সরকার
৫৩ শিউলি ফোটা ভোর/জ্যোৎস্নালিপি

ছড়া-কবিতা

০৬ আ.ফ.ম মোদাচ্ছের আলী/আরেফিন রব
০৭ পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী
১৩ শেকসপীয়র কায়সার/বাসুদেব খাস্তগীর
তানজিন দেলওয়ার খান/ অনার্য আমিন
১৪ হামীম রায়হান/সুজন শান্তনু/হাসান রুহুল
রিমন হোসাইন
১৫ তাসনীম বিন আলম/রাহান তাপস
কাকলী বিশ্বাস/মাহবুব মিয়াজী
১৬ জুয়েল মাহমুদ/মো. শুভ খান
ইসলাম তরিক/লাবিবা আক্তার
১৮ নাসরীন জাহান
৫২ হুমায়ূন কবীর ঢালী
৫৪ শাশ্বত ওসমান

ছোটোদের লেখা

১০ ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম/ রুমান হাফিজ
১৭ বাম হাতের খেলা/অবনিল আহমেদ
৪৫ অজিদের হারালো টাইগাররা/
রওনক মারুফ শুদ্ধ

প্রতিবেদন

৬০ বাংলাদেশ একটি মানবিক দেশ
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
৬১ আমি দেশের মাটিতে চিকিৎসা নেব : প্রধানমন্ত্রী
মো. জামাল উদ্দিন
৬১ শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর/প্রসেনজিৎ কুমার দে
৬৫ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ/মেজবাউল হক
৬৬ তোমাকে অভিবাদন বাংলাদেশ
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

আঁকা ছবি

৫৫ অনাবিল মাহবুব নিসর্গ
৬২ জান্নাতুল নাইমা/কাজী ইসতিয়াক ইসলাম
৬৩ আফসানা আক্তার মোহনা/তিশা বিশ্বাস
৬৪ আহান ইসলাম/সুস্মিতা বোস শ্রেয়া

নবারুণ

শিশু কিশোরের মাসিক পত্রিকা

ঘোষণা

পরিবারের বা এলাকার বড়োদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা জেনে লিখে পাঠাও নবারুণে। বড়োদের কাছে শুনে তোমাদের 'চোখে' দেখা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত স্মৃতিকথা ছাপা হবে নবারুণে।

মতামত...

লাইজু আহমেদ মহুয়া

নবারুণ ম্যাগাজিনটি কীভাবে পেতে পারি? জানাবেন প্লিজ।

নবারুণ পত্রিকাটি সারা দেশে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এর বাইরেও পত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট ৩৩% কমিশনে পত্রিকা পাচ্ছেন। আপনার এলাকায় এজেন্ট আছে কি না, তা জেনে নিতে পারেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বিতরণ শাখা থেকে। আর লেখা ছাপা হলে প্রকাশিত লেখার লেখকের প্রদত্ত ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। নবারুণ-এর চাঁদা বার্ষিক ২৪০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা। বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। মানিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা : সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা -১০০০। ফোন- ৯৩৫৭৪৯০। (মোবাইল: জনাব সায়েম হাওলাদার, সহকারী পরিচালক-০১৭১০৭৭০১৭১)

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে এবং facebook.com/nobarunpotrikabd সাইটে পত্রিকাটি পড়া যাবে, মতামতও দেওয়া যাবে।

বন্ধুরা, তুমি পড়তে শিখেছ। তোমার ছোটো ভাই বা বোনটি কি পড়তে শিখেছে? বাড়ির পাশে খুঁজে এমন কেউ কি আছে, যে এখনো পড়তে শেখেনি? যারা এখনো পড়তে শেখেনি বা কেবলমাত্র পড়তে শুরু করেছে, তাদের জন্য আছে সুখবর। নবারুণ এখন থেকে খুব সহজ গল্প রাখবে এই নতুন পড়ুয়াদের জন্য। এই যেমন, এবারের সংখ্যার ৩৭ পৃষ্ঠায় আছে **'নিতুর রঙিন একদিন'**। ওরা নিজে নিজে পড়তে পারবে। আটকে গেলে তুমি তো আছোই!

শেখ রাসেল [১৮ অক্টোবর, ১৯৬৪ - ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫]

নেপালের উজালি ও বাংলাদেশের রাসেল

সেলিনা হোসেন

অক্টোবর মাসকে আমি নানা কারণে স্মরণ করি।
এ মাসে বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়।
একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নির্মম শিকার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শিশুপুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন এ মাসে।
এবং এই মাসটি আমার নিজের ছেলে শমিকেরও জন্মমাস।
এ মাসের ঋতু শরৎ। এ মাসের ফুল সুরভিত শিউলি।

এত মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের পরও মন কেন বিষণ্ন হয়ে যায়?

নানাবিধ কার্যকারণ একটার সঙ্গে আর একটা যুক্ত হয়ে যায় বলে সময়ের হেরফের হয়। আগের সময় পরে আসে, পরের সময় আগে চলে যায়। আমরা সূত্র বাঁধি। বাঁধি বলেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়।

গত আগস্ট মাসে কাঠমান্ডু গিয়েছিলাম। ইউনিসেফ-বিবিসি রাইটার্স ওয়ার্কশপে যোগদান করতে। বিষয় শিশু। ইউনিসেফ শিক্ষামূলক কার্টুন ছবি 'মীনা' প্রযোজনা করেছে। বিবিসি বাংলা সার্ভিসও 'মীনা' প্রচার করেছে। বিবিসি থেকে আসা প্রশিক্ষক হেলার বত্ত বলেছেন, 'মীনা' অনুষ্ঠানটি এত জনপ্রিয় হয়েছিল যে, তাদের একটি পুনঃপ্রচার করতে হয়। আগামী বছর বিবিসি বাংলা বিভাগ 'মীনা' সিরিজের তেরোটি পর্ব প্রচার করবে। এই ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও পাকিস্তানের লেখকরা অংশ নেন। তেরো পর্বের 'মীনা' সিরিজে কী কী থিম অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, সেটা বাছাই করার লক্ষ্যই ছিল এই ওয়ার্কশপের।

এখানে আমরা 'উজেলি' নামের একটি ডকু-ফিল্ম দেখি। তৈরি করেছে ইউনিসেফ, নেপাল। 'উজেলি' নেপালের একটি সাধারণ পরিবারের মেয়ে। এই পরিবারের ছেলে শিশুটির সঙ্গে তার আকাশ-পাতাল তফাত। সব মনোযোগ ছেলে শিশুটি পায়। উজেলির কোনো প্রতিবাদ নেই। মুখ বুজে সহ্য করে। ওকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে বাল্যবিয়ে দেওয়া হয়। শ্বশুর বাড়িতে ওকে সব কাজ করতে হয়। ওই বাড়ির আরেকটি ভাইয়ের কিশোরী স্ত্রী ওর একমাত্র বন্ধু। সেই মেয়েটি অল্প বয়সে একটি সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যায়। উজেলি নির্বাক তাকিয়ে থাকে। শিশুটির

বাল্যবিয়ে বিষয়ক নেপালি ডকু-ফিল্ম 'উজেলি'র একটি দৃশ্য

'শুনেছি উজেলির ভূমিকায় যে গ্রামের মেয়েটি অভিনয় করেছে, তাকে কাঠমান্ডুতে রেখে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নেপালের বাকি উজেলিদের কী হবে?'

যত্ন করে এবং পরিবারের দৈনন্দিন কাজে আবার ডুবে যায়। ছবিটি দেখে চোখের পানি রাখতে পারিনি। শুনেছি উজেলির ভূমিকায় গ্রামের যে মেয়েটি অভিনয় করেছে, তাকে কাঠমান্ডুতে রেখে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু নেপালের বাকি উজেলিদের কী হবে?

এমন একজন উজেলি কুমারী দেবী। ওদের ভাষায় লিভিং গড। ধর্ম তাকে দেবী বানায়। দেশের জনসাধারণের সঙ্গে রাজাও তাকে প্রণাম করে। একটি বিশেষ উৎসবের দিনে সজ্জিত শকটে করে সে প্রদক্ষিণ করে রাজধানী কাঠমান্ডু শহর। শহরের লোক ভেঙে পড়ে রাস্তায়। উৎসব-আনন্দ চারদিকে।

আমাকে এই কুমারী দেবী দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল অমৃতা বাস্কোটা। নেপালের নারীবাদী কর্মী। কলাম লেখক। ওর শক্ত কলাম বেশ জনপ্রিয়। গত নির্বাচনের সময়ে ও সার্ক দেশগুলোর নির্বাচক পর্যবেক্ষক দলের সদস্য হয়ে ঢাকায় এসেছিল। ঢাকায় ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ও বিদেশি আর আমি স্থানীয় পর্যবেক্ষক হয়ে ময়মনসিংহ জেলায় নির্বাচন প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিলাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। এখানকার জন্য ভিন্ন বিষয়।

নেপাল গিয়ে অমৃতাকে ফোন করলে ও আমাকে কাঠমান্ডুর আশপাশে বেশ কতগুলো দর্শনীয় জায়গায় নিয়ে যায়। একদিন সন্ধ্যায় নিয়ে এল কুমারী দেবী দেখাতে। মন্দিরের চত্বরে চারকোনা একটি বেদি। তার ওপর চমৎকার একটি মালতী লতা। সাদা ছোটো ফুলে বোঝাই হয়ে আছে। সরু সিঁড়ি বেয়ে আমরা দোতলায় উঠে একটি ঘরে গেলাম।

কোথায় দেবী?

একটি বালিকা এবং দুজন বয়স্ক মহিলা ঘরে বসে আছে। মেয়েটির বয়স অনুমান করি সাত অথবা আট হবে। ঘরের এক কোনায় বসে সম্ভবত খেলছিল। আমাদের দেখে দৌড়ে এসে একটি পাটাতনের ওপর দাঁড়ায়। পরনে জরি লাগানো ঘাঘরার মতো পোশাক।

কাঠমাণ্ডুতে কুমারী দেবীর মন্দিরে শিশু কুমারী দেবী

ছোট্ট ঘরটির দরজা ছাড়া দুটো জানালা আছে। আসবাব তেমন কিছু নেই।

ও বলল, দেবী এই ঘরের বাইরে বের হতে পারবে না এবং ভবিষ্যতে কোনো দিন বিয়ে করতে পারবে না।

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে আমি চমকে অমৃতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। অস্ফুট স্বরে বলি, অমানবিক। পরে অন্য নেপালিদের কাছ থেকে জেনেছি, সব মেয়েরা এটা মানে না। কেউ কেউ অন্য জায়গায় গিয়ে বিয়ে করে। আমি খানিকটা স্বস্তি ফিরে পাই।

ওয়ার্কশপে অংশ নেওয়া ব্রিটিশ হেদার বন্ড কুমারী দেবী সম্পর্কে বললেন, কে ওকে বিয়ে করবে? ও কি ঘরের কাজ কিছু শেখে? কিছুই তো জানে না।

আমি বললাম, এটা কী বলছো হেদার? ঘরের কাজ শিখতে কয়দিন লাগে? বারো-তেরো বছর পর্যন্ত ঘরের কাজ শেখেনি বলে ও কোনো সংসার পাবে না? স্বামী-সন্তান পাবে না?

হেদার উত্তর দেয় না। অথচ আমরা সবাই মিলে 'উজেলি' নামের ফিল্ম দেখে ভারাক্রান্ত হই। বিবিসি থেকে উজেলিদের অবস্থার পরিবর্তনের মানসে অনুষ্ঠান করা হয়। একেই কি বলে প্রদীপের নিচে অন্ধকার?

পরদিন অমৃতা আমাকে কাঠমাণ্ডুর সবচেয়ে বড়ো পশুপতির মন্দিরে নিয়ে যায়। দেবতা শিবের আর এক নাম পশুপতি। ষাঁড় তাঁর বাহন। আমি বিদেশি বলে আমাকে মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বাইরে থেকে দেখি মন্দিরের চত্বরে এক খণ্ড পাথর দিয়ে তৈরি বিশাল ষাঁড়। দেখে বিস্মিত হতে হয়। পশুপতি মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ধারে দেখেছিলাম শ্মশান। অমৃতা দেখালো কতগুলো বাড়ি। বলল, এই মন্দিরের আশপাশে ষাট-সত্তরটি পরিবার থাকে। নারীরা সন্তান জন্মের সময়ে হাসপাতালে যেতে পারে না। যদি কেউ হাসপাতালে যায় এবং পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে তবে সেই ছেলেটি বড়ো হয়ে কোনোদিন মন্দিরের ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

নারী কর্মী অমৃতার কণ্ঠে ক্ষোভ ধ্বনিত হয়। বলে, জানি না কীভাবে এইসব সমস্যার সমাধান হবে।

আমারও মনে হলো, ওই এক খণ্ড বিশাল পাথর দিয়ে তৈরি করা ষাঁড়টির মতো অনড় কুসংস্কারের নিগড়। শিশুদেরকেও ছাড়ে না। হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসার অধীনে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়ার অধিকারও খর্ব করে রাখে ধর্মীয় কুসংস্কার। অথচ মানুষের মঙ্গলের জন্যই তো সবকিছু। মানুষই তো পারে একে শিশুদের জন্য উপযোগী করে তুলতে। করে না কেন?

এখানেই প্রশ্ন আসে। যারা ভালো কিছু করতে চায় না, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণে, তারা নির্মমভাবে হত্যা

করে শিশুদের। পঁচাত্তর সালের আগস্ট মাসে শুধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়নি। হত্যা করা হয়েছে পরিবারের শিশুদেরও।

আমি জানি না, বঙ্গবন্ধুর পরিবারে তাদের কনিষ্ঠ সদস্যের নামটি প্রখ্যাত মনীষী বার্টান্ড রাসেলের নামের অনুসরণে রাখা হয়েছিল কি না।

'যারা ভালো কিছু করতে চায় না, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কারণে, তারা নির্মমভাবে হত্যা করে শিশুদের।'

বার্টান্ড রাসেল ভিয়েতনামে আমেরিকান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন। শিশু রাসেলের তেমন কিছু করার সুযোগ হয়নি। কে জানে বেঁচে থাকলে সে হয়ত বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার উদ্যোগ নিতে পারত। রাসেল বেঁচে থাকলে এই দাবি তার কাছেই করতাম আমি। আফসোস, আমি তা পারিনি। তবে আনন্দ একটাই, শেখ রাসেলের প্রিয় 'হাসু আপা' যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পেরেছেন। জাতির পিতা হত্যার বিচার করেছেন। বিচার হয়েছে শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্ট কালরাতের সব হত্যার।

বিচার সম্পন্ন হয়েছে। তবে হত্যাকারীদের অনেকেই এখনো পালিয়ে আছে পৃথিবীর নানান দেশে। এদেরকে দেশে ফিরিয়ে এনে শাস্তি কার্যকর করতে হবে। তাহলে শিক্ষা পাবে হত্যাকারীরা। সবাই জানবে, শিশু হত্যার মতো জঘন্য অপরাধ যারা করে, তাদের কোনো রেহাই নেই।

১৯৫৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্বজুড়ে শিশুদের নিয়ে হইচই হয়। শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন, র‍্যালি, আনন্দ-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আরো কত কি! পাশাপাশি শিশু রাসেলের মতো আর কোনো শিশু যেন হত্যার শিকার না হয়, নির্যাতিত না হয়, সে ব্যবস্থাও চাই। উজেলিদের অবস্থার পরিবর্তন চাই। কোনো শিশু যেন পরিবার ছাড়া, দেশ ছাড়া না হয়, সে নিশ্চয়তা চাই। এই অক্টোবর মাসে এইটুকু প্রত্যাশা পূরণে বড়োরা এগিয়ে আসুন, সেই কামনা করি। না হলে শিশুরা কি দায়িত্ব নেবে এসবের?

[লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালে। এই সময়ের জন্য প্রাসঙ্গিক করেই নবারুণ-এ প্রকাশিত হলো লেখাটি।]

রাসেল আছে

আ. ফ. ম. মোদাচ্ছের আলী

একটি রাসেল কোথায় গেছে
রাসেল নাকি নাই,
বাংলাদেশের বুকের মাঝে
রাসেল তোমায় পাই।

নরঘাতক উর্দি পরা
নেকড়েগুলোর কাছে
পাওনি রেহাই তুমি রাসেল
যদি মুজিব বাঁচে?

তোমার কোনো কান্নাকাটি
ছোঁয়না ওদের মন
এক পলকে কেড়ে নিলো
বাবার বুকের ধন।

কিন্তু ওরা পারেনি তো
কাড়তে মানিক সোনাকে
লাল সবুজের বুকের মাঝে
মুজিব স্বপন বোনাকে।

মায়ের কাছে যাবো

আরেফিন রব

ফোটার আগেই ঝরে গেল
বৃন্ত থেকে ফুল
বুকের মাঝে রাখছি পুষে
হয় না কোনো ভুল।
আগস্ট এলে রক্ত ঝরে
ফিনকি দিয়ে বুকে
জাতির বিবেক চুকরে কাঁদে
ভাই হারানোর শোকে।
আজো রাসেল কাঁদছে যেন
মায়ের কাছে যাবো...
রাসেল সোনা আয় ফিরে আয়
কোথায় তোকে পাবো।
হাসু আপার চোখের জলের
বাঁধ ভেঙেছে যেন...
ঘাতকরা বল্ ছোট্ট শিশুর
প্রাণটা নিলি কেন?

যে রাসেল আজ ষোলো কোটির প্রেমে

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

এই ছবিটি স্বপ্ন বোনার
এই ছবিটি মুক্তা কণার
এই ছবিটি রাসেল সোনার।

এই রাসেলকে মারলো কারা?
বুলেট-গুলি ছুঁড়লো কারা?
তা সবারই জানা;
কিন্তু তাদের করতে বিচার
ছিল অনেক মানা।

ছোট্টমণি রাসেল সোনা
যার হাসিতে হীরের কণা ঝরে
তাকে ঘাতক মারলো কেমন করে
চক্ষে লাগে ধাঁ-ধাঁ।

ছোট্ট রাসেল শিকার যাদের
আজকে বিচার হচ্ছে তাদের
নেই যে কোনো বাধা।

ঝাঁঝরা করে রাসেল সোনার বুক
বাড়িয়েছে ঘাতকেরা বাংলা মায়ের
কোটি শিশুর দুখ।

কী দোষ সেদিন করেছিল ছোট্ট রাসেল সোনা?
কোন সে অপরাধের জন্য সেদিন তাকে মাতাপিতা
ভাই-ভাবি আর স্বজন সবার সাথে
করতে হলো খুন!

রাসেল ছিল যাদের শিকার
জানাই তাদের লক্ষ ধিক্কার
তাদের মুখে পড়ুক জাতির
থুথু, কালি-চুন।

কাঁপতেছে তাই গুপ্তঘাতক
ছিল যারাই মস্ত পাতক

আলোর রাসেল দেখে তারা মরছে ভয়ে-ভয়ে
পঁচাত্তরের পাপিষ্ঠরা যাবেই এবার ক্ষয়ে।
দিকে দিকে পাচ্ছি এখন আভাস
প্রকাশ করছে চন্দ্র-সূর্য, লক্ষ-কোটি তারা
ফুল, পাখি আর নদী-মাটি, আকাশ, বাতাস

রাসেল সোনার গুণ;
চক্রব্যূহ নির্মাণ করে
অধর্মকে ধর্ম ধরে
অন্যায় এবং অসৎ পথে সপ্তরথীর দ্বারা
ছোট্ট বালক অভিমন্যু বধের কথাই হচ্ছে এবার ধুন।

এক রাসেল আজ লক্ষ রাসেল হয়ে
জন্ম নিলো দুখিনি মা সোনার বাংলার
দুঃখ নাশের জন্যে।
যে রাসেল আজ ঘরে ঘরে টাঙানো নীল ফ্রেমে
সে রাসেলকে হত্যা করে পারলো ঘাতক

রাখতে খানিক থেমে?
যে রাসেল আজ ষোলো কোটির প্রেমে।

ব্রহ্মপুত্রের পৃথিবী ভ্রমণ

মীম নোশিন নাওয়াল খান

অনেক অনেক দিন আগের কথা। হিমালয় পর্বতমালার কাছে ছিল এক কাঠুরের বাড়ি। সেই কাঠুরের এক ছেলে ছিল। সে ছিল খুব চঞ্চল। একদিন কাঠুরের ছেলে বায়না করল, তাকে পাহাড় দেখাতে নিয়ে যেতে হবে। সে ছোট্টবেলা থেকে এই পাহাড়ের কাছে থাকে, অথচ পাহাড়কে সে ঠিক করে দেখেইনি!

কাঠুরে প্রথমে মোটেই রাজি হচ্ছিল না। ছোট্ট ছেলেটাকে পাহাড়ে নিয়ে যেতে সে খুব ভয় পেতো। কিন্তু ছেলের কান্নাকাটি আর মন খারাপ দেখে সে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো। একদিন খুব সকালে সে তার ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল পাহাড় দেখাতে।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো, কাঠুরে আর তার ছোট্ট ছেলে পাহাড় বেয়ে উঠছে তো উঠছেই। ঠান্ডায় ছোট্ট ছেলেটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু কাঠুরে বারবার বাড়ি যাওয়ার কথা বললেও সে রাজি হচ্ছিল না। সে বারবার বলছিল, আরেকটু উপরে উঠি না বাবা! আরেকটু দেখি না!

দুপুর যখন শেষ হয়ে বিকেল নামার উপক্রম হলো, তখন কাঠুরে ও তার ছেলে ক্ষুধায় কাতর। কাঠুরের বউ তাদের সঙ্গে কিছু খাবার দিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হিমালয়ের ঠান্ডায় সেগুলো জমে গিয়েছিল। কাঠুরে তার ছেলেকে বলল, তুমি একটু এখানে থাকো, আমি দেখি আগুন জ্বালানোর জন্য কিছু শুকনো পাতা বা কাঠ জোগাড় করতে পারি কিনা। তারপর আগুন জ্বালিয়ে খাবারগুলো একটু গরম করে খাওয়া যাবে।

ছোট্ট ছেলেটা সায় দিল।

কাঠুরে চলে যাওয়ার পর ছেলেটা ভাবল, সে একা একা বসে থেকে আর কী করবে? বরং জায়গাটা একটু ঘুরে দেখা যাক। এই ভেবে সে হাঁটতে শুরু করল।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল। ছোট্ট ছেলেটা ভাবল, এবার ফিরতে হবে। কিন্তু ফিরতে গিয়ে সে দেখল, সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সে আর ফেরার পথ খুঁজে পেলো না। সে ওখানে বসে কাঁদতে শুরু করল।

কাঠুরের ছোট্ট ছেলেটা হাঁটতে হাঁটতে যেখানে এসে পৌঁছে ছিল, সেটা ছিল তিব্বতের পশ্চিম অংশে হিমালয় পর্বতমালার কৈলাস শৃঙ্গের কাছে জিম ইয়ংজং হিমবাহ। সেখানে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে ছেলেটা কাঁদতে লাগল।

স্বর্গ থেকে দেবতা ব্রহ্মা ছোট্ট ছেলেটাকে কাঁদতে দেখলেন। তার কান্নার কারণটাও জানতে পারলেন। তিনি একটা বুদ্ধি করলেন। স্বর্গ থেকে একটা নদীকে পাঠিয়ে দিলেন ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে।

সেই নদীটা জিম ইয়ংজং হিমবাহ থেকে নেমে এল। ছেলেটাকে ডেকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি।

ছোট্ট ছেলেটা নদীর সঙ্গে চলতে লাগল। নদীটা প্রথমে তিব্বতের মধ্যে দিয়ে চলল। সেই অঞ্চলের লোক তার নাম দিল জাংপো। এরপর সে ভারতে ঢুকে পড়ল। ভারতের অরুণাচলে ছিল কাঠুরের বাড়ি। এখানে এসে সে কাঠুরের ছোট্ট ছেলেকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিল।

ছেলেটাকে খুঁজে না পেয়ে কাঠুরে আর তার বউ খুব কান্নাকাটি করছিল। তাকে খুঁজে পেয়ে কাঠুরে আর তার বউ তো ভীষণ খুশি। তারা নদীটাকে অনেকবার ধন্যবাদ দিল।

ছোট্ট ছেলেটাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে পেরে নদীটাও ভীষণ খুশি। সে ভাবল, সে আর ফিরে গিয়ে কী করবে? সে বরং পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখবে।

অরুণাচল থেকে সিয়ং নাম নিয়ে নদীটা চলতে লাগল।

এরপর সে পৌঁছালো আসামে। এখানকার লোকেরা তার নাম দিল দিহাং। আসামে এসে দিহাং নদীর সাথে দেখা হলো দিবং এবং লোহিত নামের আর দুটো নদীর। এই নদী দুটোও ঘুরতে বেরিয়েছিল। তাই তারা তিনজন একসঙ্গে চলতে শুরু করল।

একসাথে চলতে চলতে আসামের সমভূমিতে তিনটি নদী একসাথে একটা বিশাল বড়ো নদ হয়ে গেল। যেহেতু ব্রহ্মা তাদের সবাইকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল বিভিন্ন কাজে, তাই তাদের তিনজনের একসাথে নাম হলো 'ব্রহ্মপুত্র নদ'। আসাম উপত্যকায় অনুপ্রস্থভাবে ৭২০ কিলোমিটার লম্বা পথ পাড়ি দিল ব্রহ্মপুত্র। তারপর নদটা গারো পাহাড়কে ঘিরে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রামের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ল। ময়মনসিংহের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় গিয়ে মিশল।

১৭৮৭ সালে একটা বড়োসড়ো ভূমিকম্প হলো, সেই সাথে বন্যা। তখন ব্রহ্মপুত্র নদ বেশ ভয় পেয়ে গেল। সে তার চলার পথ পরিবর্তন করে ফেলল। নতুন যেই পথে ব্রহ্মপুত্র চলতে শুরু করল, তার নাম দেওয়া হলো যমুনা নদী। গোয়ালন্দের কাছে গিয়ে যমুনা নদী মিশল পদ্মার সাথে।

উৎপত্তিস্থল থেকে যমুনার দৈর্ঘ্য ২৪০ কিলোমিটার। নদীটার সর্বাধিক প্রস্থ ১২০০ মিটার। যমুনা মূলত ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী। এই যমুনারও আবার উপনদী আছে। এগুলো হলো- তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, সুবর্ণশ্রী। বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের চলার পথ খুব একটা বড়ো না। তবে এই নদে অনেক চর আছে। দেশের উত্তর-দক্ষিণ মুখে প্রবাহিত এই নদীপ্রণালী সবচেয়ে প্রশস্ত।

হিমালয়ে উৎপত্তির জায়গা থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ ২৮৫০ কিলোমিটার লম্বা হয়ে গেল। আর এর সর্বোচ্চ প্রস্থ ১০,৪২৬ মিটার। বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে ব্রহ্মপুত্রই সবচেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রভাবিত এলাকা প্রায় ৫,৮৩,০০০ বর্গ কি.মি. যার ৪৭,০০০ বর্গকিলোমিটারের অবস্থান বাংলাদেশ এলাকায়।

এভাবেই কাঠুরের ছোট্ট ছেলেকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে পৃথিবী ঘুরে বেড়ালো ব্রহ্মপুত্র নদ। শেষ পর্যন্ত সে পদ্মার সঙ্গে মিশে একাকার হলো। এখন তারা একসাথে হেসেখেলে, গল্প করে দিন কাটায়।

প্রথম বর্ষ, ডিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

পরিবারের বা এলাকার
বড়োদের কাছ থেকে
মুক্তিযুদ্ধের সত্য ঘটনা জেনে
লিখে পাঠাও নবারুণে।
বড়োদের কাছে শুনে তোমাদের
'চোখে' দেখা আমাদের
মুক্তিযুদ্ধের নির্বাচিত স্মৃতিকথা
ছাপা হবে নবারুণে।

ছোট্ট মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম

রুমান হাফিজ

গ্রামের বাড়িতে আসলে আমি ঘরে বসে থাকতে পারি না। কোথাও না কোথাও ঘুরতে বেরিয়ে পড়ি। শহুরে বন্দি জীবন থেকে বের হওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য। তবু একটু সুযোগ পেলেই আমি ছুটে আসি গ্রামের বাড়িতে। যেখানে আমার ভালোলাগার সব উপকরণ বিদ্যমান। সুবিশাল মাঠ, নদী, খাল-বিল, গাছগাছালি কিংবা কাদামাখা মেঠো পথ আরো কত কি!

সেদিন বিকেলবেলা বাড়ির পাশেই একটা মুদি দোকানে বসে বন্ধুদের সাথে গল্প করছিলাম। মুদি দোকানি আজিজ মামা আর আমরা চারজন বলতে মতি, সুমন, মুয়াজ ছাড়া আর কেউ ছিল না তখন।

আমাদের আড্ডা চলছে এমন সময় এসে হাজির হলেন এনাম চাচা। পুরো নাম শফিকুল হক এনাম হলেও এনাম নামেই পরিচিত সবার কাছে। এলাকাজুড়ে এনাম চাচার অন্য একটা পরিচয় রয়েছে তা হলো তিনি একাত্তরে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

চাচা আমাদের পাশে বসলেন। আমরা তখন চাচার সাথে কথা বলতে শুরু করলাম। হঠাৎ আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, আচ্ছা চাচা যখন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তাহলে তো চাচার থেকে যুদ্ধকালীন তথ্য জানা যাবে।

আমি চাচার কাছে জানতে চাইলাম -

-আচ্ছা চাচা, আপনি তো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। তখনকার কোনো ঘটনা যদি বলতেন।

-অসুবিধে নেই, নিশ্চয় বলব ভাতিজা।

চাচা তখন বলতে শুরু করলেন।

পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রিতে পাকবাহিনী আমাদের

নিরীহ বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অসংখ্য মানুষকে সেদিন তারা হত্যা করেছিল নারকীয় কায়দায়। তখন সারা দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় শুরু হলো। স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেই ঘোষণা শুনে সবাই যে যার মতো করে মুক্তি সংগ্রামে শরীক হলো।

আমি তখন ক্লাস এইটে পড়ি। খুব একটা বড়ো না হলেও তখনকার পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে বুঝতে পারতাম। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা দেশের চলমান অবস্থা নিয়ে বেশ কথাবার্তা বলতেন। আমাদেরকে দেশের জন্য সদাসর্বদা জাগ্রত থাকতে বলতেন।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর স্কুল কলেজ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমার সাথে যারা পড়ত তাদের অনেকেই মুক্তিসেনার খাতায় নাম লিখিয়ে ট্রেনিং-এ চলে যায়।

আমি তখনো যেতে পারিনি। এর কারণ হলো আমাকে পরিবার থেকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না ছোটো বলে। কিন্তু আমার আর ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না। রেডিওতে নিয়মিত সংবাদ শুনতাম। পাক সেনাদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় মুক্তিসেনার লড়াইয়ের খবর প্রচারিত হতো।

লোকমুখে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নানা কথাবার্তা শুনে আমি সুযোগ খুঁজছিলাম কীভাবে যাবো। একদিন রাতে ঘরের বারান্দায় বসে রেডিওতে খবর শুনছিলাম। এমন সময় হঠাৎ করে কার যেন গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম কিছু দূর হতে। আমি রেডিও রেখে দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম, তিন চার জন মানুষ আমাদের বাড়ির রাস্তা দিয়ে কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছিল। পথিমধ্যে আমাকে দেখে তারা জিজ্ঞেস করে। আমি তখন বাড়ি দেখিয়ে বললাম, এই যে আমার বাড়ি।

তাদের কাছে আমি পরিচয় জানতে চাইলাম। তারা প্রথমে বলতে না চাইলেও আমার পীড়াপীড়িতে একজন বলল, আমরা মুক্তিযোদ্ধা। ওরা মুক্তিযোদ্ধা শুনে আমার তর সইছিল না। আমি তাদের সাথে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলাম।

আমার কথা শুনে উনারা একজন আরেকজনের দিকে চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। হয়ত বা এত ছোটো ছিলাম যে উনারা আমার কথা শুনে কি বলবেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। তবে সেদিন আমাকে না নিয়ে আশ্বাস দিলেন, কয়েকদিন পর নিয়ে যাবেন। আমি তাদের অপেক্ষায় ছিলাম।

প্রতিদিন রাতে ঠিক এই সময়টাতে আমি তাদের সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

কিন্তু তাদের সাথে আর যাওয়া হয় নি। তার আগে আমার এক বন্ধুর সাথে মুক্তিসেনাদের ক্যাম্পে চলে আসি। প্রথমে আমাদের দুজনকে দেখে উনারা কি করবেন দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েন। আমাদের ভীষণ ইচ্ছে দেখে সাথে রাখবেন বলে আশ্বস্ত করলেন।

ক্যাম্পে মুক্তিসেনাদের ট্রেনিং দেখতাম। উনারা বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন করতে যেতেন। শুনতাম, কীভাবে পাক সেনাদের সাথে লড়াই করতেন। একদম কাছে থেকে তখন মুক্তিযুদ্ধ দেখতে পেরেছিলাম। মনে মনে ভাবতাম যদি আমাদেরও যুদ্ধ করতে নিতেন এবং ট্রেনিং দেওয়াতেন।

এই চাওয়া বেশিদিন অপূর্ণ থাকেনি। আমাদের ক্যাম্পের প্রধান একদিন আমাদের দুজনকে নিয়ে বসলেন এবং কিছু কাজ বলে দিলেন। এর মধ্যে অন্যতম ছিল- নিয়মিত রেডিওতে খবর শোনা। তবে এ কাজ করতে হবে একদম আড়ালে গিয়ে, তারপর নিজেদের ক্যাম্পে সতর্ক অবস্থায় থাকা, পাক সেনাদের ক্যাম্পে ছদ্মবেশে চোখ রাখা এবং তাদের চলাফেরার দিকে খেয়াল রাখা।

আমরা আমাদের উপর আরোপিত কাজ করে যেতে লাগলাম।

একদিন একা আমি পাকবাহিনীর একটা ক্যাম্প দেখে আসার জন্য গেলাম (ছোটো বলে ওরা আমাদের উপর তেমন নজর দিত না)। দেখা শেষ করে ফিরব এমন সময় এক পাক সেনার সামনে পড়ে যাই। আমাকে জিজ্ঞেস করে, এখানে কি করি।

আমি উত্তরে হাত দেখিয়ে বললাম, দোকানে গিয়েছিলাম খরচ আনতে। কিন্তু দোকান বন্ধ।

সেদিনের মতো বেঁচে যাই।

এর কিছুদিন পর আমি আবার পাক সেনাদের ক্যাম্পে যাই। দূর থেকে ওদের আলাপ পুরোপুরিভাবে শুনতে পারছিলাম না। তাই আরেকটু কাছে গিয়ে আড়ি পাতলাম।

ওরা সবাই মিলে আলাপ করছিল, কীভাবে বাঙালিদের শেষ করে দেবে, কীভাবে হত্যা করে, কোথায় কীভাবে অপারেশন চলছে ইত্যাদি। আলাপের একপর্যায়

শুনতে পেলাম ওদের একজন বলছে আগামীকাল তো সোনাপুর ক্যাম্পে আমাদের অপারেশন।

সোনাপুর বলতে যে ক্যাম্পটায় আমি এবং আমাদের মুক্তিসেনারা অস্থায়ী বাস করছি।

সোনাপুর অপারেশন করতে আসছে শুনে আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করল। নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে আসি। আমাদের ক্যাম্প প্রধানের কাছে খবরটা পৌঁছে দেই। উনি সবার সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নেন, কীভাবে ওদের অপারেশন প্রতিহত করা যায়। সবার সিদ্ধান্তক্রমে আমরা খুব দ্রুত ক্যাম্প ত্যাগ করি।

ওদের অপারেশন প্রতিহত করতে আমাদের প্রস্তুতি চলতে লাগল। এদিকে আমি ও আমার বন্ধু পাক সেনাদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের অবস্থা দেখে আসি।

রাত তিনটা।

চারিদিকে নিস্তব্ধতা।

কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই।

দূর থেকে ভেসে আসছে ঝিঁঝিপোকার ডাক।

হঠাৎ করেই গুলির আওয়াজ এসে কানে বাজে। বুঝতে আর বাকি নেই ওরা এসে গেছে আক্রমণ চালাতে। আমরা আমাদের কৌশলী অবস্থান থেকে দেখার চেষ্টা করছি। ওরা আক্রমণ করেই যাচ্ছে। আমাদের থেকে কোনোরূপ পালটা আক্রমণ না পেয়ে মনে মনে বেশ খুশি হয় পাক সেনারা। ক্যাম্পের একদম কাছে এসে আক্রমণ চালাতে থাকে। তবুও কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

আস্তে আস্তে ওদের গুলির আওয়াজ কমতে থাকে। আমরা তাদের অবস্থা বুঝার চেষ্টা করে এগিয়ে আসি। যখন আর কোনো আওয়াজ হচ্ছিল না, ঠিক তখনি শুরু হয় আমাদের পক্ষ থেকে পাক সেনাদের লক্ষ্য করে আক্রমণ। আকস্মিকভাবে আক্রমণে ওরা দিগবিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। পিছন দিক থেকে আমাদের আক্রমণে ওরা একেবারে নাজেহাল হয়ে পড়ে। কিছু সময়ের মধ্যে পাক সেনাদের সবাইকে খতম করে দিতে সক্ষম হই। সেদিন প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন পাক সেনা আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করে। সেদিনের কৌশলী যুদ্ধ আজও আমার মনে পড়ে, তখন গর্বে বুকটা ভরে উঠে।"

১ম বর্ষ, জালালাবাদ ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি, ইসলামপুর, সিলেট।

শিশুদের অধিকার ও বিশ্ব শিশু দিবস

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরাই ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তোমরাই সবুজে সাজিয়ে তুলবে পৃথিবী, শান্তির পতাকা পৌঁছে দিবে প্রতিটি ঘরে। তোমাদের আর্দশ মানুষ, শিক্ষিত নাগরিক এবং জাতির কর্ণধার হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিটি বাবা-মা, সেই সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনগুলোও কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে জাতিসংঘ বছরের একটি দিনকে বিশ্ব শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস। পৃথিবীর প্রায় ১২৪ টি দেশ প্রতিবছর এই দিনে বিশ্ব শিশু দিবস পালন করে। কি মন খারাপ হলো একটি দিনের কথা শুনে। আরে না.. বছরের প্রতিটি দিনই তোমাদের জন্য। এই একটি দিন তোমাদের জন্য আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ নেই আর সারা বছর সেগুলো বাস্তবায়ন করি। কখনো কখনো তোমাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও গ্রহণ করি যাতে তোমরা এই পৃথিবীর যোগ্য কাণ্ডারি হয়ে উঠতে পারো।

এ বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেক তোমরা। তোমাদের সংরক্ষণ আর কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘসহ অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা। তোমরা কি জানো বন্ধুরা ১৯৪৪ সালে সম্মিলিত জাতিগোষ্ঠী 'শিশু অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা"-এর মাধ্যমে শিশুদের অধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ 'বিশ্ব মানবাধিকার সনদ' গ্রহণ করে যার আওতায় শিশুদের অধিকার সন্নিবেশিত হয়। এরপর ১৯৮৯ সালের ২০ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে 'শিশু অধিকার সনদ' সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সেখানে শিশুদের চাহিদা আর অধিকারের কথা বলা আছে। বাংলাদেশে ১৯৯০ সালের ২ সেপ্টেম্বর থেকে এই সনদের কার্যকারিতা শুরু হয়। প্রতিবছর বিশ্ব শিশু দিবস পালনের মধ্য দিয়ে তোমাদের সেসব অধিকারের বিষয়ে আমাদের সচেতন করা হয়।

এত সব আয়োজনের পরেও আমরা হারিয়ে ফেলছি শেখ রাসেলসহ অনেক শিশুকে। মানবেতর জীবন যাপন করছে হাজারো রোহিঙ্গা শিশু। এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনা আমরা চাই না তারপরেও ঘটে যায়। এসব রোধ করতে হলে আমাদের কাজ করতে হবে এক সাথে। অকালে যেন হারিয়ে না যায় একটি শিশুও, এবারের বিশ্ব শিশু দিবসে এই প্রতীজ্ঞাই করি।

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

গণভবন চলো

শেকসপীয়র কায়সার

হরেক রকম নানান রকম মজার খাবার
খেতে যদি চাও
ছোটো-বড়ো সবে মিলে গণভবন যাও।
মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা জানান ঈদের শুভেচ্ছা
খেতে দেন মন ভরে যার যত ইচ্ছা।
সারি বেধে গেলাম সবাই গণভবন প্রাঙ্গনে
প্রধানমন্ত্রী ঈদ মোবারক
বলেন খুশি মনে
হাস্যোউজ্জ্বল মুখে যেন তাঁর
মুক্তো ঝরে পড়ে
প্রিয় মুখের প্রিয় হাসি
শুধুই মনে পড়ে !
শুধুই... মনে পড়ে।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, আনন্দ মাল্টিমিডিয়া স্কুল
কাঁচপুর, নারায়ণগঞ্জ।

আমার গাঁয়ে

তানজিন দেলওয়ার খান

আমার গাঁয়ের গাছে গাছে
নানান পাখির মেলা
ফুলে ফুলে প্রজাপতি
কেবল করে খেলা।
আমার গাঁয়ে দিঘির জলে
শাপলা শালুক হাসে
ঝলমল করে শিশির ফোঁটা
সবুজ দূর্বা ঘাসে।
আমার গাঁয়ে পথে পথে
নানান ফুল যে ফোটে
সন্ধ্যা হলে দূর আকাশে
চাঁদমামা ঐ ওঠে।
আমার গাঁয়ে কাদামাটি
ছড়ায় মায়ার ঘ্রাণ
আদর শাখা শ্যামল ছায়া
জুড়ায় সবার প্রাণ।

৮ম শ্রেণি, ফয়জুর রহমান আইডিয়াল
ইনস্টিটিউট, বনশ্রী, ঢাকা।

কোথায় গেলে পাই?

বাসুদেব খাস্তগীর

পাখির ডাকে ভাঙল ঘুম রাঙল মন দোর
আঁখির কোণে জাগল দেখি নতুন রাঙা ভোর।
আবির মেখে আকাশ যেন করছে হাসাহাসি
এমনি এক মধুর ক্ষণে বাজল মনে বাঁশি।
মাটির কোলে স্বর্গ এল মুগ্ধ চেয়ে আঁখি
জড়িয়ে থাকা ভালোবাসায় দারুণ মাখামাখি।
ফুলের বনে বাতাস এসে দোলায় ক্ষণে ক্ষণে
ভালোবাসার অনেক কথা জমছে আজি মনে।
তরুছায়ায় বসতে যেন মনটি সদা দোলে
রূপটি দেখে হয় যে মনে মায়ের আছি কোলে।
রাত্রি জাগা চাঁদের আলো তারার মেলা দেখে
স্বপ্নগুলো দেয় যে ধরা নতুন করে এঁকে।
ইচ্ছে করে সবুজ মাঠে দু-চোখ মেলে রই
কোথায় গেলে এমনি দেশ পাই বলো যে কই ?

এই দেশেতে

অনার্য আমিন

সবুজ শ্যামল এই দেশেতে
সাগর নদী গাছপালা বন
মানুষ পাখি আর প্রকৃতি
সবাই আপন বন্ধু স্বজন।
দোয়েল কোয়েল ময়না টিয়ে
গান গেয়ে যায় সকাল দুপুর
সন্ধ্যা রাতে জোনাক আসে
পায়ে দিয়ে সোনার নূপুর।
ঝিঁঝি পোকার ডাক শুনে তাই
ঘুম ভেঙে যায় গভীর রাতে
চাঁদের বুড়ি জোছনা বিলায়
প্রকৃতি তার প্রেমে মাতে।
চাঁদের আলোয় স্বপ্ন কুড়াই
স্বপ্ন কুড়াই সোনার দেশের
এই দেশেতে ঠাঁই পেয়েছি
তাই তো বলো দুঃখ কীসের?

মাঠ পেরিয়ে বন

হামীম রায়হান

পড়তে আমার মন বসে না-
চাইছে শুধু ঘুরতে,
নাটাই ছেড়া ঘুড়ির মতন-
নীল আকাশে উড়তে।
প্রজাপতির পাখায় চড়ে-
ছুটছে এ মন দূরে,
রাখালিয়া বাজায় বাঁশি-
এক অচেনা সুরে।
কখনো বা ছুটছি আমি-
শাপলা ফোটা জলে,
কখনো বা ভোর বেলাকার-
কনকচাঁপার দলে।
জোছনা রাতে বাঁশ বাগানের-
চাঁদ হতে চায় মন,
পড়া ফেলে মন ছুটে যায়-
মাঠ পেরিয়ে বন।

বন্ধু

হাসান রুহুল

বন্ধু মানে একটু আশা
অপার ভালোবাসা
বন্ধু মানে ছায়ার মতো
আরো কাছে আসা ।

বন্ধু মানে রাগ অভিমান
আবার মিলন হওয়া
বন্ধু মানে সুখের ঝিলিক
অনেক চাওয়াপাওয়া ।
বন্ধু মানে আশার আলো
ফুলের মতো মৌ
বন্ধু মানে সত্যপথের
সঙ্গী হওয়া কেউ।

লক্ষ্য

সুজন শান্তনু

হলেই হব ফুল,
গানের পাখি কিংবা নদী
নায়ের মাঝি হব যদি
কণ্ঠে থাকে সুর;
প্রীতির প্রতীক ফুল
আঁধার করে দূর
আলো হব, ভালো হব
মানুষ হওয়াই মূল,
তা না হলে ফুলের জীবন
ষোলো আনাই ভুল।

পড়ার কথা

রিমন হোসাইন

পড়ার কথা বললে আমার
গায়ে আসে জ্বর ,
শিক্ষক যদি পড়া ধরেন
বুক করে ধড়ফড়।
সকালবেলা আব্বু বকেন
বিকেলবেলা ভাই ,
রাত্রি হলে তখন আবার
দাদুর বকা খাই।
আজ থেকে তাই পণ করেছি
পড়ব যতন করে ,
দেখে যেন সকলেরই
খুশিতে মন ভরে।

দশম শ্রেণি, নাদুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাংশা , রাজবাড়ী।

নূতনের তরে কবিতা

তাসনীম বিন আলম

যে হাসিতে সূর্য উঠে ভোর হয়,
কিচিরমিচির ডাকে পাখি
সেই হাসিতে স্বপ্ন দেখে তোমরা শোনো,
শোনো পৃথিবী বলে রাখি,
আমরা সবাই ব্যস্ত যখন পাপ কিংবা পাপ মোচনে
সেই হাসিটি জ্বলছে ঠিকই শীত অথবা তাপ লোচনে।
স্বপ্ন দেখি এই হাসিই রাতের শেষে
খুব সকালে ঘুম ভাঙাবে
তপ্ত দুপুর সিক্ত করে স্নিগ্ধ বিকেল
বন রাঙাবে, মন রাঙাবে।
আশীর্বাদ করি, হে নূতন, তুমি মেঘের মতো বও
ভালোর সাদা পেঁজাতুলো, মন্দের বজ্রবাহক হও।
হও বড়ো হও, সামনে এগোও, তোমার পাশেই থাকব
নিজের চোখে জল হলেও তোমার হাসি রাখব।

একাদশ শ্রেণি, ঝুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ, ঝুমিল্লা

ছড়া ছড়ায়

রাহান তাপস

ছড়ার নামই
ছড়াছড়ি
ছন্দ দিয়ে
গড়াগড়ি।
লাফালাফি
জড়াজড়ি
কোথা থেকে
কোথা ঘুরি।
এইভাবে
ছড়া ছড়ায়
আবোল-তাবোল
কথা বলায়।
ছড়া ছড়াই
আর, মন মাতাই
ছড়ার সাথে চল
দোস্ত পাতাই।

আমার অধিকার

কাকলি বিশ্বাস

খেলব আমি ফুলের সাথে
গাইব গান পাখির সাথে
কাটব সাঁতার মাছের সাথে
কইব কথা গাছের সাথে
থাকবে না বাবার শাসন
চলবে না মায়ের বকুনি
মানব না স্কুলের বেড়াজাল
তবু আমি শিখে নেব সবকিছু
এটাই আমার অধিকার।

৫ম শ্রেণি, কদমতলা হাই স্কুল, বাসাবো

কথার কথা

মাহবুব মিয়াজী

কথার হাটে বেচাকেনা
কথার ব্যাপার করো,
মুখের কথায় মুক্তি মিলে
আসল কথা ধরো।
কথার আছে শক্তি বটে
গুণ যদি বা থাকে,
কথাই আনে দ্বন্দ্ব - বিবাদ
রিপু দুর্বিপাকে।
বলছি কথা আবোল-তাবোল
পাগল মতো ঠেকে,
ভুল পথে যাই ভুল ঠিকানায়
জীবন মেলার বাঁকে।
দশটি কথা শুনলে না হয়
একটি কথা বলো,
সহস্র ঝড় পেরিয়ে গেলে
একটু না হয় টলো।

মুজিব

জুয়েল মাহমুদ

কার ছিল এমন ভাষণ
বজ্রের ন্যায় গর্জন
কার সেই ভাষণে
বাংলা হলো অর্জন?

চিনছ তুমি? তিনি হলেন
বাঙালিদের পিতা
তাঁর অবদান সহজেই
যায় ভুলা কী তা?

কি কি কি
বাঙালিরা রাখবে এ নাম
মনের মাঝে লিখি।

আর,
ইতিহাসটা বদলাবে
সাহস আছে কার?

নবম শ্রেণি, ইছামতি কামিল মাদরাসা,ভাকিগঞ্জ, সিলেট।

ভাসব সবার ঘ্রাণে

ইসলাম তরিক

দূরাকাশের নীল নীলিমায়
বলব মনের কথা
ঘন মেঘের বৃষ্টি হয়ে
ঝরব যথা-তথা।
ফুল বাগানের ফুলে ফুলে
ফুটব আপন বেশে
মিষ্টি ফুলের দৃষ্টি খুলে
ঘ্রাণ ছড়াবো দেশে।
রোজ বিহানে পাখির মতো
কিচিরমিচির সুরে
নদীর স্রোতে কষ্টগুলো
ভাসিয়ে দেবো দূরে।
পূবাকাশের সূর্য হয়ে
শক্তি দেবো প্রাণে
সুখ বিলানো পায়রা হয়ে
ভাসব সবার ঘ্রাণে।
আঁধার রাতের চন্দ্র হয়ে
ছড়িয়ে দেবো আলো
শক্ত হাতে রুখব আমি
এই সমাজের কালো।

আমরা শিশু

মো. শুভ খান

শিশু বান্ধব পরিবেশ
আমরা সবাই চাই
বেড়ে উঠতে সুস্থ সমাজের
কোনো বিকল্প নাই।

আমরা শিশু
চাই না হিংসা মারামারি
সবাই মিলে এসো
সুন্দর আগামী গড়ি।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, শান্তিবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা।

প্রজাপতি

লাবিবা আক্তার

উড়তে আমি ভালোবাসি
আমার আছে রং-বেরঙের
ছোটো দুটি ডানা
তিড়িং বিড়িং উড়ি আমি
নেই যে কোনো মানা।
ফুলের কাছে ঘুরে বেড়াই
ফুলই আমার সাথি
ছোটো প্রজাপতি,
আমি ছোটো প্রজাপতি।

৫ম শ্রেণি, মতিঝিল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়

বাম হাতের খেলা

অবনিল আহমেদ

চা নাশতা করার পরেই উহ্- আহ্ শুরু করলেন ব্যাংকের ম্যানেজার রাফেক। সাথে সাথে তার পিয়ন লতিফকে ডেকে বললেন অ্যাসিডিটির ঔষধ গোলাতে এবং সিসি ক্যামেরার দিকে নজর রাখতে। তারপর বাথরুমে ঢুকে মনে মনে ভাবছিলেন নয়টি সিঙ্গারা খাওয়া ঠিক হয়নি।

দুই ঘন্টা বাদে বাথরুম থেকে বের হলেন। তারপর ঔষধ খেয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়েই দেখেন ফুটেজ দেখা যাচ্ছে না। রাফেকের মনে হলো যে সিসি ক্যামেরা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই তিনি লকারে যান আর দেখেন যে ক্যামেরা নষ্ট হয়ে মাটিতে পড়ে আছে আর ব্যাংক থেকে ২০ কোটি টাকা চুরি হয়ে গেছে।

রাফেক আর দেরি না করে পুলিশকে ফোন করলেন। গোয়েন্দা পুলিশ সাথে সাথে এসে তল্লাশি শুরু করল। আর গোয়েন্দা ইন্সপেকটর মরশেদের সাথে হ্যান্ডশেক করলেন রাফেক। তারপর তিনিও কাজে নেমে পড়লেন।

কোথাও আঙুলের ছাপ নেই। সব গ্লাভস পরে করা হয়েছে। এভাবে তিন দিন তল্লাশি করা হলো কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। শেষে মরশেদ বললেন, রাফেক সাহেব এই কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব না। বিশেষ গোয়েন্দা দরকার এই কাজে।

তারপর রাফেক বললেন, বিশেষ গোয়েন্দা কোথায় পাব?

মরশেদ বললেন, আমার পরিচিত একজন গোয়েন্দা আছে।

মরশেদ তাকে ফোন করল এবং ১৫ মিনিটের মধ্যে হাজির হয়ে গেল বিশেষ গোয়েন্দা সাম্য। মরশেদ বললেন, সাম্য এটা খুব জটিল কেস।

সাম্য বলল, যত জটিল হোক আমি সমাধান করতে পারব।

মরশেদ রাফেক সাহেবের সঙ্গে সাম্যর পরিচয় করিয়ে দিল। সাম্য বলল, ওই লকারের সমস্ত বস্তুর ফিঙ্গার প্রিন্টস আমাকে দিন।

মরশেদ বললেন, সব কাজ গ্লাভস পরে করা হয়েছে। তাই কোথাও কোনো ছাপ নেই।

এরপর সাম্য দেখল, একটা জায়গার মাঝখানে টাকা আছে। কিন্তু এর দুই পাশে টাকা নেই। তারপর ওই জায়গা থেকে টাকা সরালো আর দেখতে পেল একটা রাস্তা। তখনি সাম্য বুঝে গেল যে এই জায়গা দিয়ে টাকা নেওয়া হয়েছে।

মরশেদ বলল, যদি এদিক থেকে টাকা নেওয়া হয়, তাহলে এখানে টাকা আবার রাখল কী করে?

তখনি সাম্যর মাথায় আসলো যে এই কাজটা দুইজন মিলে করেছে। লকার থেকে বের হয়ে এদিক ওদিক তাকায় সাম্য। মরশেদ জিজ্ঞাসা করলেন, সাম্য কী করছ?

সাম্য বলল, চোরকে খুঁজছি।

মরশেদ বললেন, চোরকে ধরার কোনো সূত্র পেয়েছ?

তখনি সাম্য বলল, ক্যামেরাটা কোথায়?

মরশেদ দেখলেন যে ক্যামেরাটা লকারের গেটের বাম দিকে পড়ে আছে। সাম্য বলল, এটা কোনো বাম হাতির কাজ।

সাম্য রাফেক সাহেবকে বলল, এই ব্যাংকে বাম হাতি কে কে?

রাফেক বললেন, আমার পিয়ন লতিফ বেশি বাম হাত দিয়ে কাজ করে।

সাম্য রাফেককে বলল, এই চুরির অনেক বড়ো সূত্র পেয়ে গেছি। লতিফকে সাম্যর সামনে হাজির করা হলো। সাম্য ওকে সোজা ভাবে বলল, তুমি কী বাম হাতি?

লতিফ বলল, না।

সাম্য ওকে একটা কাগজ আর একটা কলম দিয়ে বলল, এখানে তোমার নামটা ডান হাত দিয়ে লেখ।

লতিফ ডান হাত দিয়ে খুবই কষ্ট করে লিখল এবং সাম্যকে দিল। সাম্য বলল, তোমার হাতের লেখা খুবই বাজে। শোনো, আমার আরেকটা কাজ করে দিতে হবে।

লতিফ বলল, আচ্ছা।

তারপর সাম্য কৌশলে একটা টাকার বান্ডেল নিল এবং লতিফের গায়ে ছুড়ে মেরে বলল, ক্যাচ!

লতিফ বাম হাত দিয়ে ধরল সেটা। সাম্য বলল, তুমি বাম হাতি আর এই কাজটা তুমি করেছ।

লতিফ স্বীকার করল। তখন সাম্য বলল, আর কে কে ছিল তোমার সাথে?

লতিফ বলল, এই ব্যাংকের ঝাড়ুদার কাউসার।

তাকেও গ্রেফতার করা হলো। এরপর মরশেদ সাম্যকে বললেন, যে কাজ আমি তিন দিনে পারিনি সে কাজ তুমি এক দিনে করে দিলে! ধন্যবাদ। তারপর মরশেদ রাফেককে বললেন, আমার চেয়ে মনে হয় ওর বুদ্ধি বেশি।

রাফেক বললেন, বুদ্ধি সবারই আছে। কিন্তু সবাই সেটা কাজে লাগায় না।

মরশেদ হেসে দিলেন। হাসল সৌম্যও।

৮ম শ্রেণি, রূপনগর মডেল স্কুল ও কলেজ, ঢাকা।

নাসরীন জাহানের

ছড়া

গায় মেখেছি চাঁদের মাখন
চুলে পাতার ছাউনি,
গুচ্ছ ফুলে হাত ভরেছি
উদাস উদাস চাউনি।

চাঁদের বাটি উপুড় করে
আকাশ নেমে আসছে,
পাগল হাওয়ায় শব্দ করে
বাঁশবনেরা হাসছে।

শীতল পাটির রাস্তা ধরে
নিঝুম রাতে হাঁটছি,
ঝলসে উঠা ধবল দাঁতে
স্বর্ণলতা কাটছি।

এমন রাতের মিষ্টি সুরে
চাঁদের পানি ছলকে
পায়ের চটি উড়িয়ে দিলাম,
সমুদ্দুরের জলকে।

হাসি

কুমার প্রীতীশ বল

দৃশ্য ১: রাজদরবার

ব্যস্ত মহারাজ। রাজদরবারে পায়চারি করছেন আর ডাকছেন মন্ত্রীকে।

রাজা : মন্ত্রী ... মন্ত্রী ...। কোথায়? কোথায় তুমি?

মন্ত্রী : হাজির মহারাজ। আপনার সমুখে হাজির।

রাজা : গতরাতে আমি এক স্বপ্ন দেখেছি।

মন্ত্রী : স্বপ্ন! আপনি স্বপ্ন দেখেছেন?

রাজা : হ্যাঁ ... হ্যাঁ ... হ্যাঁ। আমার পরিষ্কার মনে পড়ে, আমি স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু ...

মন্ত্রী : কিন্তু কী মহারাজ?

রাজা : কিন্তু ...

মন্ত্রী : কিন্তু ...

রাজা : কিন্তু কী তার অর্থ?

মন্ত্রী : কিন্তু কী তার অর্থ?

রাজা : হ্যাঁ ... হ্যাঁ কী তার অর্থ?

মন্ত্রী : মহারাজ কার অর্থ?

রাজা : স্বপ্নের অর্থ।

মন্ত্রী : স্বপ্নের অর্থ!

রাজা : বুঝেছি, এ তোমার কর্ম নয়। তোমার কর্ম আদেশ পালন। অর্থ জানতে হলে জ্ঞানী লোক দরকার।

সেনাপতি : মহারাজ রাজকবি এসেছেন।

মন্ত্রী : এ তো দেখছি মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

সেনাপতি : প্রহরী, মহারাজের নির্দেশ, রাজকবিকে দরবারে নিয়ে আস।

মন্ত্রী : মহারাজ, এবার নিশ্চই আপনার স্বপ্নের অর্থ আমরা জানতে পারব।

রাজা : কাজটা কঠিন। তারপরও মনে হয়, রাজকবির পক্ষে হয়ত এই কঠিন সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হবে।

রাজকবি : জয় হোক মহারাজের। জয় হোক সকলের।

রাজা : আসুন ... আসুন রাজকবি। আপনার কথাই আমরা ভাবছিলাম। ঐ সময়েই আপনার আগমন বার্তা পরিবেশিত হলো।

রাজকবি : কী সৌভাগ্য আমার। কী সৌভাগ্য। মহারাজের কাছে আমার এখনো প্রয়োজন আছে।

মন্ত্রী : কেন থাকবে না রাজকবি। আমাদের মহারাজ একজন জ্ঞানী লোক। জ্ঞানী লোকের কাছেই তো জ্ঞানীর কদর।

সেনাপতি : মন্ত্রী মহোদয় ঠিকই বলেছেন। রাজ্যের যত নদী-সাগর-মহাসাগর আছে, তার সমস্ত পানি একত্রিত করে যদি কালি বানায়, রাজ্যের যত গাছ-বাঁশ আছে তা দিয়ে কাগজ বানিয়ে কয়েক শত বছর ধরে লিখলেও আমাদের মহারাজের জ্ঞানের সীমানা নির্ধারণ করা যাবে না।

রাজকবি : আমাদের মহারাজের তো অসীম জ্ঞান। তারপরও মহারাজ অনুগ্রহ করে বলুন, কেন এই অধমের অপেক্ষায় ছিলেন?

মন্ত্রী : মহারাজ গত রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছেন।

সেনাপতি : মহারাজের স্বপ্ন নিশ্চই মহান হবে।

রাজা : গত রাতে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু এই স্বপ্নের অর্থ কী তা বুঝতে পারছি না।

রাজকবি : মহারাজ, কবি বলেছেন-

স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অমৃত সমান
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

রাজা : গত রাতে আমি একটু আগেই ঘুমিয়েছিলাম। রাত কয়টা হবে ঠিক মনে নেই। দেখি কি আমার মাথার কাছে কয়েকটি বানর। ওরা কয়েকজন মিলে আমার মাথায় উকুন বাছছে। এ সময় ওরা আমাকে খুব আদর করে। কিন্তু আমি একটু নড়াচড়া করলেই ওরা রেগে যায়। আমাকে চড় মারে। আমার চোখে-মুখে লাগে ওদের নখের আঁচড়। সহসা আবার ওরা হারিয়ে যায়। তারপর আসে এক বেদে। সে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার ভাগ্য গণনার টিয়া পাখিটা উড়ে গেছে। আমি বললাম, আমি তোমাকে আর একটা টিয়া পাখি দিব। অমনি বেদেটি আমাকে ঘাড়ে তুলে নেয়। তখন কোথা থেকে একজন থুরথুরে বুড়ি এসে আমার পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিতে থাকে। ঐ সুড়সুড়িতে আমার বড্ড হাসি পায়।

সুড়সুড়ির কথা বলতে বলতে রাজা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। রাজার হাসি ধীরে ধীরে সংক্রামিত হয় উপস্থিত পরিষদের মধ্যে।

রাজকবি : তারপর মহারাজ...।

তখনো হাসি চলে। রাজা হাসতে হাসতে বলে।

রাজা : তারপর আমার ঘুম ভেঙে যায়।

রাজকবি : মহারাজ, কবি বলেছেন -

স্বপ্ন মঙ্গলের কথা অমৃত সমান
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

রাজা : কিন্তু রাজকবি আমার এই স্বপ্ন দেখার কারণ কী?

মন্ত্রী : হ্যাঁ মান্যবর রাজকবি আমরা এই স্বপ্নের মানে বুঝতে চাই।

সেনাপতি : মান্যবর রাজকবি, যদি আপনার জানা থাকে এই স্বপ্নের কারণ তবে আমাদের অনুগ্রহপূর্বক শুনিয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত করুন।

রাজকবি : এ রাজ্যের প্রজা সকল কোনো কারণে নিশ্চই এখন হাসতে ভুলে গেছে।

রাজা : কী বললেন, আমার প্রজারা হাসতে ভুলে গেছে? মন্ত্রী!

মন্ত্রী : আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা : রাজকবির এই সংবাদ কী সত্যি?

মন্ত্রী : মহারাজ মান্যবর রাজকবির এই সংবাদ সত্যি না।

সেনাপতি : হ্যাঁ মহারাজ, মান্যবর রাজকবির এটা অনুমান মাত্র।

রাজকবি : সত্যি-মিথ্যে-অনুমান কিনা জানি না। মহারাজের স্বপ্নের অর্থ কিন্তু সে কথাই বলে।

রাজা : তাহলে মন্ত্রী এক কাজ কর।

মন্ত্রী : আজ্ঞে বলুন মহারাজ।

রাজা : আচ্ছা থাক। তুমি না। সেনাপতি, রাজ্য জুড়ে তদন্তের ব্যবস্থা কর। আমার প্রজা সকল হাসতে ভুলে গেল কিনা। যদি সত্যি হয় তবে নতুন কিছু ভাবতে হবে।

মন্ত্রী : তাহলে নতুন আইন করতে হবে ।

রাজা : হ্যাঁ ...হ্যাঁ নতুন আইন দরকার হবে।

২য় দৃশ্য: রাজপথ

ঘোষক ঢোল বাজিয়ে রাস্তায় ঘোষণা করে। ঢোলের আওয়াজ শুনে দলে দলে প্রজারা আসে।

ঘোষক : ঘোষণা! ঘোষণা!! মহা আনন্দের ঘোষণা। মহামূল্যবান ঘোষণা! জরুরি ঘোষণা! হৈ .. হৈ .. ব্যাপার। রৈ .. রৈ .. কাণ্ড। একবার শুনলে বার বার শুনতে ইচ্ছে করে। শুনুন শুনুন প্রজা সকল। চলে গেলে কিন্তু আর পাবেন না।

প্রজা : কি ঘোষণা শুনাবে ভাই?

প্রজা : কী এমন জরুরি ঘোষণা?

প্রজা : শুনাও না তোমার মহামূল্যবান ঘোষণা।

ঘোষক : বলব ... বলব। হৈ .. হৈ .. ব্যাপার। রৈ .. রৈ .. কাণ্ড।

প্রজা : বলো না তোমার ঘোষণাটি। তুমি তো ভাই রাজার ঘোষক।

ঘোষক : আমার ফরটিন জেনারেশন ধরে মহামান্য মহারাজার ঘোষকের দায়িত্ব পালন করে আসছি।

প্রজা : তোমার পর নিশ্চই তোমার ছেলে এই দায়িত্ব পালন করবে।

ঘোষক : নিশ্চই ... নিশ্চই। তা কী আর বলতে হয়।

প্রজা : তাহলে এবার বলে ফেলো মহামান্য রাজার সেই জরুরি ঘোষণা।

প্রজা : হ্যাঁ ... হ্যাঁ ... হ্যাঁ। আমরা আর ধৈর্য্য ধরতে পারছি না।

প্রজা : তুমি মহারাজের ঘোষণাটি বলো। আমরা অপেক্ষায় আছি ঘোষণা শোনার।

ঘোষক : মহামান্য মহারাজ রাজ্যের প্রজাদের হাসির পরীক্ষা নিবেন। ঘোষণা! ঘোষণা! মজার ঘোষণা। মহামান্য মহারাজ প্রজা সকলের হাসির পরীক্ষা নিবেন। ঘোষণা! ঘোষণা! জব্বর ঘোষণা!

প্রজারা : মহামান্য মহারাজ হাসির পরীক্ষা নিবেন?

ঘোষক ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা দিতে দিতে মঞ্চের বাইরে চলে যায়। এসময় কানে কম শুনে এমন একজন প্রজা এসে অন্য এক প্রজার কাছে জানতে চায়।

প্রজা : ও ভাই কিসের ঘোষণা দিয়ে গেল?

প্রজা : মহামান্য মহারাজ ফাঁসির পরীক্ষা নিবেন?

প্রজা : ফাঁসির নয় ... ফাঁসির নয়, হাসির পরীক্ষা নিবেন।

প্রজা : ও আচ্ছা বুঝেছি। কিছু মনে করবেন না। আমি কানে একটু কম শুনি তো তাই।

প্রজা : কী বুঝেছেন?

প্রজা : কেন মহামান্য মহারাজ হাঁচির পরীক্ষা নিবেন।

প্রজা : হায় কপাল হাঁচির নয় হাসির। হাসির পরীক্ষা নিবেন।

প্রজা : কী বললেন হাঁচির নয়।

প্রজা : হ্যাঁ ... হ্যাঁ। হাঁচির নয়। হাসির।

প্রজা : ও এতক্ষণে বুঝেছি। মহামান্য মহারাজ মাছির পরীক্ষা নিবেন।

প্রজা : এ তো মহা মুশকিল দেখছি।

প্রজা : কিসের মুশকিল ভাই।

প্রজা : মহামান্য মহারাজ ঘোষণা দিয়েছেন প্রজাদের হাসির পরীক্ষা নিবেন। কথাটা ভদ্রলোককে কোনোভাবেই বোঝানো যাচ্ছে না।

প্রজা : কেন কী বলেন। তিনি কি রাজার আদেশ অমান্য করবেন?

প্রজা : আরে না। ভদ্রলোক কানে কম শুনেন।

প্রজা : তাহলে এক কাজ করুন। সকলে মিলে একত্রে বলুন। তাহলে শুনবে।

এসময়ের মধ্যে প্রজাটি কানের মেশিনটা ঠিক করে নেয়।

সকলে : এক -দুই-তিন। মহারাজ হাসির পরীক্ষা নিবেন।

সকলের অট্টহাসি।

৩য় দৃশ্য: সেনাপতির অফিস

সেনাপতি আর মন্ত্রী কথা বলছেন।

মন্ত্রী : সেনাপতি, ঘোষক ব্যাটাকে কি ঘোষণা দিতে বলেছেন?

সেনাপতি : কেন হাসির পরীক্ষার কথা বলেছি।

মন্ত্রী : ডাকুন আপনার ঘোষককে! জিজ্ঞেস করুন, সে কী ঘোষণা করেছে?

সেনাপতি : *(দ্বাররক্ষককে)* ঘোষককে ডেকে আন এক্ষুণি। মহামন্ত্রী আপনি কি কিছু শুনেছেন?

মন্ত্রী : শুনিনি। দেখে এসেছি।

সেনাপতি : কী দেখেছেন?

মন্ত্রী : রাজদরবারে দলে দলে লোক। জিজ্ঞেস করলাম কেন এসেছে। বলল, মহামান্য মহারাজ নাকি তাদের হাসির পরীক্ষা নিবেন।

এসময় ঘোষকের প্রবেশ করে।

ঘোষক : মহামন্ত্রী, সেনাপতি মহোদয় আপনারা আমাকে স্মরণ করেছেন?

সেনাপতি : তুমি কী ঘোষণা করেছ? রাজদরবারে এত লোক কেন?

ঘোষক : আমি বলেছি মহামান্য মহারাজ প্রজা সকলের হাসির পরীক্ষা নিবেন।

সেনাপতি : আমি কি তোমাকে তাই বলেছিলাম?

মন্ত্রী : থাক। আমি বুঝেছি। তুমি যাও। প্রজা সকলকে এখানে নিয়ে আস।

ঘোষক চলে যায়।

মন্ত্রী : আপনিই প্রজাদের হাসির পরীক্ষা নিবেন। আর বলবেন, এটা বাছাই পর্ব। এখানে যারা পাস করবে তারাই একমাত্র মহামান্য মহারাজের সামনে পরীক্ষা দিতে যেতে পারবে। আমি গেলাম। পরে খবর নিব।

মন্ত্রী চলে যায়। সেনাপতিকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে হয়। সেনাপতি পায়চারি করে। ঘোষক প্রবেশ করে।

ঘোষক : মান্যবর প্রজারা সকলে হাজির।

সেনাপতি : একজন একজন করে নিয়ে আস।

ঘোষক বাইরে যায়। সেনাপতি চেয়ারে বসে। ঘোষক একজন একজন করে আনে। সেনাপতির সামনে দাঁড়িয়ে হাসির পরীক্ষা দেয়। তারপর চলে যায়। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের হাসি দেয়। কয়েকজনের পরীক্ষা হলে সেনাপতি ঘোষককে হাত তুলে থামতে বলে।

সেনাপতি : আর দরকার নেই। জানিয়ে দাও পরীক্ষার ফলাফল পরে জানানো হবে।

ঘোষক : মান্যবর ফলাফল কী ইতিবাচক না নেতিবাচক।

সেনাপতি : তোর মুণ্ডু বাচক।

ঘোষক : শতকরা কত ভাগ পাস করেছে।

সেনাপতি : আর একটা কথা বলবি তো তোর একদিন কি আমার একদিন। যা ভাগ। যা বলছি, তাই কর।

৪র্থ দৃশ্য: রাজদরবার

রাজা অস্থির হয়ে পায়চারি করছেন।

রাজা : মন্ত্রী, এখনো আসছে না কেন সেনাপতি?

মন্ত্রী : মহারাজ এখনই এসে পড়বে। আপনি অধৈর্য হবেন না। আমি আশা করছি তিনি একটা ভালো সংবাদ নিয়ে আসবেন।

রাজা : আমি ভালো সংবাদই শুনতে চাই।

রাজকবি : কিন্তু শুভস্য শ্রীঘ্রম। ভালো সংবাদ হলো শুভ সংবাদ। শুভ কাজে দেরি কেন?

সেনাপতি : দেরি নয় ... দেরি নয়। আমি এসে পড়েছি।

রাজা : কী খবর আনলে?

মন্ত্রী : নিশ্চয় ভালো খবর।

রাজা : ভালো খবর এনেছ নিশ্চয়।

সেনাপতি : অবশ্যই ভালো খবর এনেছি মহারাজ।

রাজকবি : তবে দেরি কেন? শুনিয়ে দিন।

সেনাপতি : হাসতে নাকি জানে না কেউ
কে বলেছে ভাই?
এই শোন না কত হাসির
খবর বলে যাই।
খোকন হাসে ফোকলা দাঁতে
চাঁদ হাসে তার সাথে সাথে
কাজল বিলে শাপলা হাসে
হাসে সবুজ ঘাস,
খলসে মাছের হাসি দেখে
হাসে পাতিহাঁস।
টিয়ে হাসে রাঙা ঠোঁটে
ফিঙের মুখেও হাসি ফোটে
দোয়েল কোয়েল ময়না শ্যামা।
হাসতে সবাই চায়,
বোয়াল মাছের দেখলে হাসি
পিলে চমকে যায়।
এত হাসি দেখেও যারা
গোমড়া মুখে চায়,
তাদের দেখে পেঁচার মুখেও
কেবল হাসি পায়।

সেনাপতি ভেবেছিল রাজা খুশি হবেন। রাজা বাহবা দিবেন। মন্ত্রী প্রথমে হেসে ছিল। কিন্তু রাজার মুখে হাসি না দেখে মন্ত্রীর মুখের হাসিও ক্রমে মিলিয়ে যায়। কয়েক সেকেন্ড নীরবতা।

রাজা : হুঁ। তো রাজকবি কী বুঝলেন?

রাজকবি : মহামান্য মহারাজ আমার কথাই ঠিক।

রাজা : আপনার কথাই ঠিক?

মন্ত্রী : আপনার কথাই ঠিক?

সেনাপতি : আপনার কথাই ঠিক!

রাজকবি : হ্যাঁ আমার কথাই ঠিক। এ রাজ্যের মানুষ হাসতে ভুলে গেছে।

রাজা : তাহলে এখন উপায়?

মন্ত্রী : মহামান্য মহারাজ উপায়খানি আমাকে বলার অনুমতি দিন।

রাজা : জানা থাকলে বলুন।

মন্ত্রী : রাজপণ্ডিতকে স্বপ্নের কারণ গণনা করার জন্য বলা হোক।

রাজকবি : হ্যাঁ আমারও তাই মনে হয়। হয়ত রাজপণ্ডিত রাশিফল গণনা করে এই স্বপ্ন দেখার কারণ উদঘাটন করতে পারবেন।

রাজা : সেনাপতি রাজপণ্ডিতকে বলো আগামীকাল আমার রাশিফল গণনা করতে হবে।

সেনাপতি : মহামান্য মহারাজ আপনার না, মনে হয় রাজ্যের রাশিফল গণনা করা উচিত।

রাজকবি : রাজ্যের কেন মান্যবর সেনাপতি?

সেনাপতি : রাজকবি, আমি ভেবেছিলাম আপনি কারণটা বুঝতে পারবেন। যেহেতু আপনি বুঝেননি তাহলে আর কেউ বুঝবেন না। অবশ্য মহামান্য মহারাজ এর ব্যতিক্রম।

রাজকবি : আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি কী বলতে চান। মহামান্য মহারাজ যেহেতু রাজ্যের প্রধান। সকল সুখ-দুঃখ তাঁকে কেন্দ্র করেই হয়। অতএব রাজ্যের ফলাফল তাঁর মধ্যেই প্রতিফলিত হবে।

রাজা : তাহলে কী রাজ্যের রাশিফল গণনা করতে হবে?

কবি ও সেনা: আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা : তবে তাই হোক।

৫ম দৃশ্য: রাজপথ

প্রজারা অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে।

প্রজা : মহামান্য মহারাজের দরবার থেকে কোনো খবর আসছে না কেন?

প্রজা : তাহলে কি আমরা কেউ পরীক্ষায় পাস করিনি?

প্রজা : সে কথাও তো আমাদের জানাতে পারত।

প্রজা : রাজ্যজুড়ে প্রজা সকল এজন্য বিচলিত বোধ করছে।

প্রজা : আমাদের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে।

প্রজা : আমাদের সন্তানদের পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রজা : আমাদের সন্তানদের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রজা : আমাদের স্ত্রীদের কলকাকলি আর শুনি না।

প্রজা : আমাদের জন্য এসব কিছু কি কোনো বিপদ সংকেত ?

প্রজা : আমার তো তাই মনে হয়।

প্রজা : আমরা কি রাজদরবারে খবর নিতে পারি?

প্রজা : না ডাকলে রাজদরবারে প্রবেশের অধিকার নেই।

প্রজা : আমরা কি ঘোষকের সঙ্গে কথা বলতে পারি?

প্রজা : রাজদরবারের সিদ্ধান্ত ঘোষকের সঙ্গে হয় না।

প্রজা : তাহলে আমাদের এখন কী করা উচিত?

প্রজা : আমরা তো নিজেরা কিছুই করতে পারি না।

প্রজা : মহামান্য মহারাজের নির্দেশ না পেলে আমরা কিছুই করতে পারি না।

প্রজা : তাহলে আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

প্রজা : হ্যাঁ আমাদের অপেক্ষায় থাকতে হয়।

৬ষ্ঠ দৃশ্য: রাজদরবার

রাজা, মন্ত্রী, রাজকবি, সেনাপতি চেয়ারে বসে আছে। তাদের চোখে-মুখে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। রাজপণ্ডিত গণনা করছে মাটিতে বসে। তার সামনে বিশেষভাবে সজ্জিত আসন। রাজপণ্ডিত একটা কাগজে ছক আঁকে আর অর্থহীনভাবে বিরবির করে।

রাজপণ্ডিত: হিং টিং ছট। অং মং চং ফট। শনি-রাহু-বুধ-শুক্র আছে। বৃহস্পতি কোথায়? যেখানে যাই শনির দৃষ্টি। রাহুর প্রভাব। হুঁ রাহুর প্রভাব ভাটার দিকে। কেন? ও ওদিকে বৃহস্পতি। না বৃহস্পতি না শুক্রকে দেখা যাচ্ছে। এদিকে আবার মঙ্গলও আছে। এ তো দেখছি মহামুশকিল।

রাজা : পণ্ডিত মশাই কিসের মুশকিল? কেন মুশকিল?

মন্ত্রী : পণ্ডিত মশাই মুশকিল আসান করুন।

সেনাপতি : হ্যাঁ পণ্ডিত মশাই আপনি মুশকিল আসান করুন।

রাজকবি : আরে আগে মুশকিলটা কী তাই শুনেনি। তারপর মুশকিল আসান করবে ।

রাজা : রাজপণ্ডিত, আপনি আমার রাজ্যের যে ভূত-ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন, তা আমাদের শুনান।

রাজপণ্ডিত: মহামান্য মহারাজ কীভাবে যে আপনাকে বলি, তাই ভাবছি। আমি স্মৃতি, পুরাণ, বেদ, ব্যাকরণ সবই তন্ন তন্ন করে দেখলাম। গণনায় আমার ভুল নাই। কিন্তু তারপরও বলতে ভয় পাচ্ছি।

রাজা : সত্যি কথা বলতে ভয় কিসের?

রাজপণ্ডিত: শনির ভীক্ষ্ণ দৃষ্টি, রাহুর চর্তুপ্রভাব। মঙ্গলের আগমন আর বৃহস্পতির অনুপস্থিতিতে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ একেবারেই অন্ধকার। এটা এমন গুরুতর অবস্থা যে, যে-কোনো সময় মহামান্য মহারাজের মৃত্যু ভয় আছে।

সকলে : মহামান্য মহারাজের মৃত্যু ভয়!

রাজা : রাজপণ্ডিত আপনি ভালো করে গণনা করেছেন?

রাজপণ্ডিত: মহামান্য মহারাজ এমন দুঃসংবাদ দেওয়ার আগে আমি কয়েকবার গণনা করেছি। আমি নিশ্চিত হয়েই বলছি।

রাজকবি : আপনার কাছে কোনো উপায় জানা আছে।

মন্ত্রী : এই বিপদ কাটানোর জন্য কোনো উপায় থাকলে বলুন।

রাজপণ্ডিত: এ রাজ্যে কোথাও কোনো অবস্থায় কান্না করা যাবে না।

রাজা : কেন?

রাজপণ্ডিত: এ সকল গ্রহের প্রভাবের কারণে রাজ্যের প্রজা সকল হাসতে ভুলে যাচ্ছে। অশুভ গ্রহের প্রভাব যখন আরো গাঢ় হবে, তখন প্রজা সকল একেবারেই হাসতে ভুলে যাবে। এক সময় হাসি ভুলে রাজ্যে প্রজাকুলে মরক লাগবে।

সকলে : হায় ... হায়।

রাজকবি : মহামান্য মহারাজ রাজপণ্ডিতের কথাতে ভুল নেই। আমিও বেদ-পুরাণ খুলে দেখেছি। এতে আপনার স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা পেয়েছি, এর সঙ্গে রাজপণ্ডিতের গণনার মিল আছে।

রাজা : তাহলে আসুন আমরা সিদ্ধান্ত নিই।

মন্ত্রী : মহামান্য মহারাজ, আমরা বিশ্বাস করি, রাজ্যের মঙ্গলের জন্য প্রজা সকলের উপকারের জন্য আপনি ভালো সিদ্ধান্তই নিবেন। আর বাস্তবায়নের জন্য তো আমরা আছি।

সেনাপতি : মহামান্য মহারাজ, আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করুন। আমরা আছি কী বলেন সকলে।

রাজা : রাজপণ্ডিত বিকল্প কোনো প্রস্তাব থাকলে তাও কিন্তু বিবেচনা করা যেত।

রাজপণ্ডিত: বিকল্প প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তা উচ্চারণ করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

রাজকবি : এতটুকু যেহেতু বলতে পারলেন, বাকিটাও বলে ফেলুন।

রাজা : হ্যাঁ বলুন।

রাজপণ্ডিত: আমি ভয়ে ভয়ে বলছি। এটা আমার মনের কথাও না। গণনায় যা উঠেছে তাই বলছি- মহামান্য মহারাজ যদি দায়িত্ব ছেড়ে দেন, তবেও হয়।

রাজা : না ... না এটা কী করে হয়।

রাজপণ্ডিত: আমারও মত তাই।

রাজা : মহামন্ত্রী, দেশে একটি নতুন আইন জারি করতে চাই।

মন্ত্রী : আদেশ করুন মহামান্য মহারাজ।

রাজা : রাজ্যের সকলকে জানিয়ে দিন, এ রাজ্যে কাল থেকে আর কেউ কাঁদতে পারবে না।

মন্ত্রী : মহারাজ এটা তো কঠিন আইন। যে কেউ পা ফসকে মাথায় চোট পেতে পারে। রোগের জ্বালায় কেউ অস্থির হতে পারে। কারো আপনজন মারা যেতে পারে। তখনো কি তারা কেউ কাঁদতে পারবে না?

রাজা : না। কেউ কাঁদতে পারবে না। কেউ যদি কাঁদে, তবে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। এ আদেশ কেউ কোনো অবস্থায় ভাঙতে পারবে না।

মন্ত্রী : সেনাপতি আপনি ঘোষককে ডেকে বলে দিন, সে যেন ঢোল পিটিয়ে জানিয়ে দেয়, এ রাজ্যে কাল থেকে কেউ কাঁদতে পারবে না। এটা মহামান্য মহারাজের আদেশ। যদি কেউ কাঁদে তবে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

৭ম দৃশ্যঃ রাজপথ

ঘোষক ঢোল পিটিয়ে পিটিয়ে ঘোষণা করে।

ঘোষক : ঘোষণা! ঘোষণা! মহারাজের ঘোষণা। রাজ্যের স্বার্থে, প্রজা সকলের স্বার্থে এখন থেকে রাজ্যে কেউ কাঁদতে পারবে না। যতই দুঃখের কারণ ঘটুক, তবু হাসতে হবে। এটি মহামান্য মহারাজের আইন। কেউ না মানলে তাকে ফাঁসিতে ঝুলানো হবে।

রাম গরুরের ছানা
কাঁদতে তোদের মানা
কান্নার কথা শুনলে কেউ
বলবে না-না-না।

ঘোষণা! ঘোষণা!! মহামান্য মহারাজের ঘোষণা !!!

প্রজা : এ কি কাণ্ড। এখন কেউ আর কাঁদতে পারবে না।

প্রজা : শিশু জন্মের পর প্রথমেই তো কান্না করে।

ঘোষক : কাঁদলেই ফাঁসি হবে।

প্রজা : কাঁদলেই ফাঁসি!

ঘোষক : রাম গরুরের ছানা
কাঁদতে তোদের মানা
কান্নার কথা শুনলে কেউ
বলবে না-না-না।
এটি মহামান্য মহারাজের আইন। কেউ না মানলে তার ফাঁসি হবে।

প্রজা : এই ঘোষণায় রাজ্যের অবস্থা বদলে যাবে।

প্রজা : আমরা এখন সব কিছুতেই হাসব।

প্রজা : মাটিতে পড়ে ব্যথা পেলেও হাসব।

প্রজা : পাঠশালায় পন্ডিত মশাই বেত মারলে ছেলে-মেয়েরা হাসবে।
প্রজা : পেটে ব্যথা করলে আমরা হাসব।
প্রজা : মা-বাবা মারা গেলেও আমরা হাসব।
প্রজা : ক্ষিধে পেলে শিশুরা হাসবে।
প্রজা : (একত্রে) রাম গরুরের ছানা
কাঁদতে মোদের মানা
কান্নার কোনো কারণ হলে
বলব না-না-না।

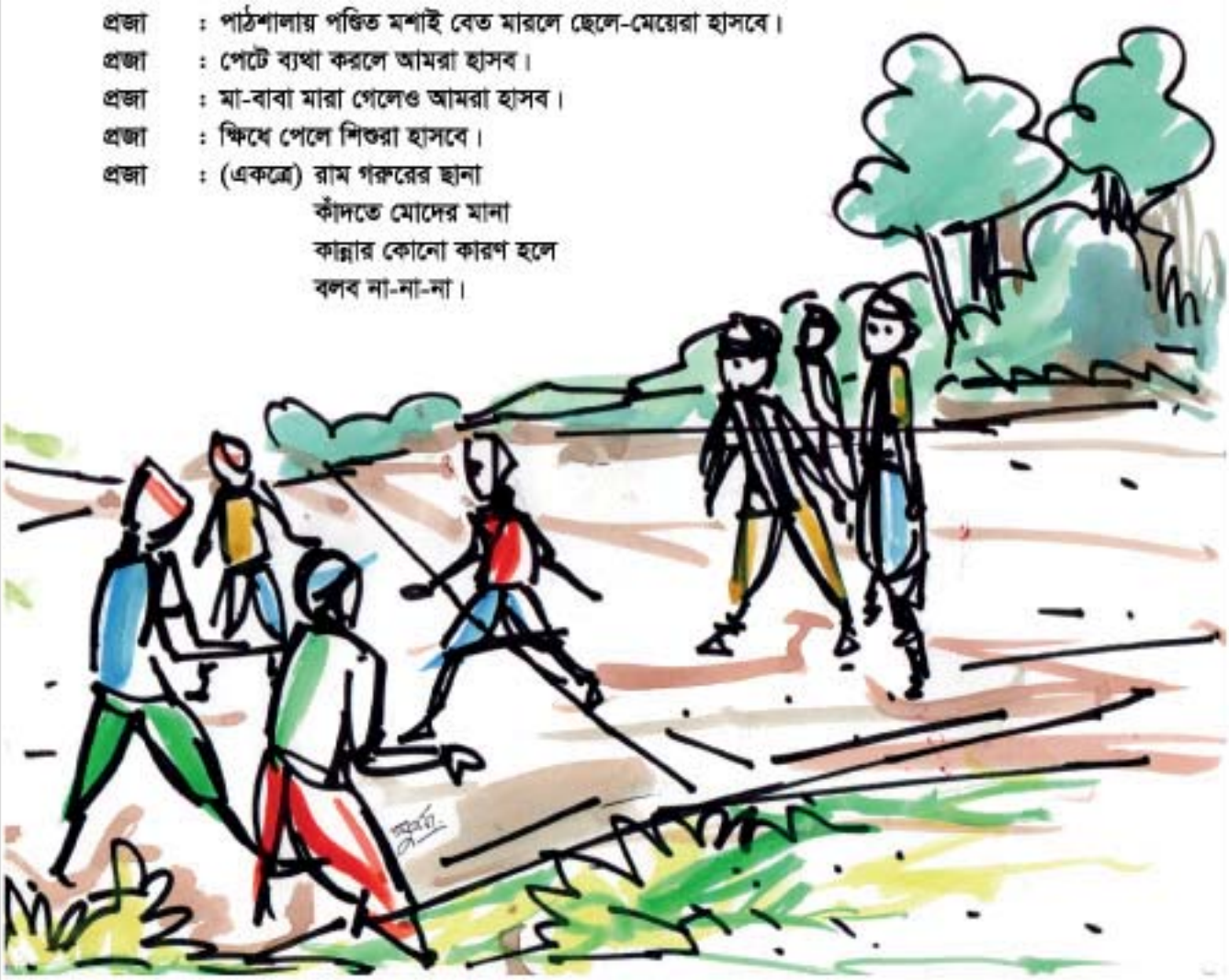

৮ম দৃশ্যঃ খেলার মাঠ

কয়েকজন ছোটো ছেলে দু'দলে ভাগ হয়ে কাবাডি খেলছে। কাবাডি খেলায় একজন খেলোয়াড় হঠাৎ পা ফসকে পড়ে যায়। ছেলেটি খুব ব্যথা পায়। তখন অন্য ছেলেরা তার সেবা করে। আহত ছেলেটি এবং তার সেবাদানকারী সকলেই কান্না ভুলে হাসতে থাকে।

ছেলে : এই ও খুব ব্যথা পেয়েছে। ওর মাথায় পানি দিতে হবে।
ছেলে : মাথায় না মাথায় না। হাতে...হাতে। মনে হয় হাতটা ভেঙে গেছে।
ছেলে : আমার মনে হয়, ওকে তাড়াতাড়ি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।
ছেলে : আমারও মনে হয়।
ছেলে : চল ... চল। তাড়াতাড়ি চল।

সকলে আহত ছেলেটিকে ধরাধরি করে নিয়ে যায়।

[সংলাপগুলো বলা এবং ছেলেটিকে নিয়ে যাওয়ার সময় সকলের মুখে অফুরান হাসি থাকবে।]

৯ম দৃশ্য: বিয়েবাড়ি

বিয়ের বাদ্য বাজছে। 'মনু মিয়ার বিয়ারে ...' গানটি বাজছে। কন্যা বিদায়ের সময়। বর কন্যা বসে আছে।

মুরুব্বি : মেয়ের কে আছেন? মেয়েকে তুলে দিন।

মা এসে মেয়েকে ছেলের হাতে তুলে দেয়। মা কান্না ভুলে হাসতে হাসতে সংলাপ বলে।

মা : বাবা আমার একমাত্র মেয়ে। ওকে আমরা এতটুকু কষ্ট দেইনি। যদি সে কখনো কোনো ভুল করে থাকে, তবে আমাদের কথা ভেবে ক্ষমা করে দিও।

বর : আম্মাজান, আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। ও আপনাদের বাড়িতে যে রকম হাসিখুশিতে ছিল, আমাদের বাড়িতেও তেমনি আনন্দে থাকবে।

মা : মাগো মুরব্বিদের কথা শুনে চলবি। আমাদের মানসম্মান নষ্ট হয় এমন কিছু করবি না।

মা-মেয়েকে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে হাসে। অট্টহাসি। এ সময় মেয়ের বাবা আসেন।

বাবা : বেয়াই সাহেব আমার একমাত্র মেয়েকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। আপনার মেয়ের মতোন দেখে শুনে রাখবেন।

বাবা এ সময় মুরুব্বিকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে। মুরুব্বি মেয়ের বাবাকে সান্ত্বনার সুরে পিঠে হাত দিয়ে কথা বলছেন।

মুরুব্বি : আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। আমাদের বাড়িতে আপনার মেয়ে ভালোই থাকবে। আপনাদের যখন দেখতে ইচ্ছে করে চলে যাবেন।

এবার কন্যার বাবা কন্যার কাছে যায়। কন্যা বাবাকে জড়িয়ে ধরে উচ্চস্বরে হাসতে থাকে। বাবা কন্যার পিঠে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে কথা বলেন।

বাবা : মাগো, তুই কোনো চিন্তা করবি না। মন খারাপ করবি না। আমরা যে যখন পারি, তোকে দেখতে যাব।

বাইরে অন্য একজন এসে আবার তাগিদ দেয়।

বরযাত্রী : তাড়াতাড়ি করেন। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

কন্যার কয়েকজন সখি কন্যাকে বাবার কাছ থেকে নিয়ে এগিয়ে দিতে যায়। এসময় সবার মুখে অট্টহাসি। একই সঙ্গে বিয়ের বাদ্যও বেজে ওঠে।

১০ম দৃশ্য: মন্ত্রীর অফিস

সেনাপতি : মহামন্ত্রী আপনি মান্যবর তারপরও বলছি, সারা রাজ্য তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেখলাম। কিন্তু কোথাও একটা লোকও পেলাম না যে কাঁদে।

মন্ত্রী : হুঁ। শুধু কী আপনি খুঁজেছেন। আমিও কী তলে তলে কম ঘোরাফেরা করেছি? কিন্তু লাভ তো কিছুই হলো না।

সেনাপতি : হ্যাঁ মান্যবর। একজন প্রজাও কাঁদে না।

মন্ত্রী : অথচ মহামান্য মহারাজ কী হুকুম করেছেন জানেন? প্রতিদিন একজন করে লোককে ধরে আনতে হবে, যাকে কান্নার জন্য ফাঁসি দেওয়া যায়।

সেনাপতি : এত দেখছি মহা মুশকিল।

মন্ত্রী : একবার আইন করলেন সবার কান্না বন্ধ। আবার এখন বলছেন, কান্নার জন্য ফাঁসিতে ঝুলানোর লোক দিতে হবে।

সেনাপতি : না হলে তো মহামান্য মহারাজের আইনের প্রচার হবে না।

মন্ত্রী : কিন্তু এ রকম খামখেয়ালিপনা করলে তো রাজ্য চলবে না।

সেনাপতি : তাহলে বলুন কী করা যায়?

মন্ত্রী : একটা উপায় তো বের করতেই হবে।

সেনাপতি : এজন্য কি আমরা রাজকবি এবং রাজপণ্ডিতের সহায়তা চাইতে পারি না?

মন্ত্রী : উনারা তো মহামান্য মহারাজের উপদেষ্টা। পরামর্শ দিয়ে তাঁদের কাজ শেষ। যত কষ্ট আমাদের।

সেনাপতি : আমি যদি মহারাজ হতাম তবে রাজ্যের সকল উপদেষ্টাদের শেষ করে দিতাম।

প্রহরী : মান্যবর মন্ত্রী এবং মান্যবর সেনাপতিকে মহামান্য মহারাজ স্মরণ করেছেন।

সেনাপতি : মহামান্য মহারাজ কোথায়?

প্রহরী : তিনি রাজদরবারে আপনাদের অপেক্ষায় আছেন।

মন্ত্রী : এখনই আসছি। চলুন যাওয়া যাক। দেরি করলে আবার ভাববে, আমরা কাজে অবহেলা করছি।

সেনাপতি : হ্যাঁ ... হ্যাঁ চলুন চলুন।

১১শ দৃশ্য: রাজ দরবার

মহারাজ দরবারে বসে দাবা খেলছেন। মন্ত্রী-সেনাপতি প্রবেশ করে।

রাজা : আমার রাজ্যে কী সবাই কান্না ভুলে গেছে? একটা লোককেও এ পর্যন্ত ফাঁসি দিতে পারিনি।

মন্ত্রী : মহামান্য মহারাজ আপনার রাজ্যের মানুষ সত্যিই কান্না ভুলে গেছে।

সেনাপতি: রাজ্যের প্রজারা এখন সব কিছুতেই হাসে। মাটিতে পড়ে ব্যথা পেলে হা-হা করে হাসে। কারো আপনজন মারা গেলেও হাসে। ছিঁচকাঁদুনে বলে যার বদনাম ছিল, সেও দেখছি এখন খিলখিলিয়ে হাসে। আমাদের লোক সারা রাজ্য ঘুরে ঘুরে দেখেছে।

মন্ত্রী : হ্যাঁ। মহামান্য মহারাজ, রাজ্যের লোক কাঁদতে ভুলে গেছে। আপনি যেহেতু ফাঁসিতে ঝুলাতে লোক খুঁজে পাচ্ছেন না। অতএব আমিই কাঁদব। আপনি আমাকেই ফাঁসিতে ঝুলান।

মন্ত্রী কাঁদার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। মন্ত্রী যতই চেষ্টা করে পারে না। কাঁদতে গেলেই হাসি এসে যায়। এক সময় সেনাপতিও চেষ্টা করে। তারও একই অবস্থা। কাঁদতে চাইলেই হাসি চলে আসে।

রাজা : যতসব মূর্খমতি। মাত্র এই কদিনে তোমরা সকলে কান্না ভুলে গেলে? তোমাদের স্মৃতিশক্তি এতই খারাপ।

এসময় ভেতর থেকে একটা নবজাত শিশুর কান্না শোনা যায়। রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি সকলেই কান খাড়া করে ওঠে। শিশুর কান্না আরো জোরে শোনা যায়।

রাজা : অন্দরমহল থেকে কান্নার শব্দ!

রাজবৈদ্য ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে আসে।

রাজবৈদ্য : আমাদের মহামান্য মহারাজ প্রথম কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছেন।

মন্ত্রী ও সেনা: মহামান্য মহারাজের জয় হোক।

রাজা : আমি কন্যা সন্তানের পিতা হয়েছি।
চলেন কবিরাজ আমি আমার কন্যার শ্রী-মুখ দর্শন করব।

মন্ত্রীও সেনা: মহামান্য মহারাজের জয় হোক।

রাজা এবং রাজবৈদ্য ভিতরে চলে যায়।

সেনাপতি : হ্যাঁ এখন দেখি মহামান্য মহারাজ কী করেন।

মন্ত্রী : এখন মহামান্য মহারাজের আইন মহারাজকেই ভাঙতে হবে।

রাজা খুশি মনেই ভিতর থেকে আসেন।

মন্ত্রীও সেনা: মহামান্য মহারাজের জয় হোক।

মন্ত্রী : মহামান্য মহারাজ, রানি মা এবং নবজাতক নিশ্চয় সুস্থ আছেন।

রাজা : হ্যাঁ তারা উভয়েই সুস্থ আছে। কিন্তু ...

সেনা ও মন্ত্রী : কিন্তু কী মহামান্য মহারাজ?

রাজা : যে শিশু ভূমিষ্ঠ হলো আজ। তার কাছে এক খবর পেলাম।

সেনা ও মন্ত্রী: কী খবর মহামান্য মহারাজ।

রাজা : তাকে দিয়ে ভাগ্যদেবী খবর পাঠিয়েছেন এক।

সেনা ও মন্ত্রী: কী খবর মহামান্য মহারাজ।

রাজা : যত হাসি তত কান্না
খবর দিল রাজকন্যা।

সেনা ও মন্ত্রী: যত হাসি তত কান্না
খবর আনল রাজকন্যা।

রাজা : হ্যাঁ ... হ্যাঁ।

একত্রে : (রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি) যত হাসি তত কান্না/ খবর আনল রাজকন্যা।

(বন্ধুরা, চাইলেই তোমরা এই মজার নাটকটি মঞ্চায়ন করতে পারো। যদি করো, খবর দিও নবারুণকে। আর লেখককে অনুগ্রহ করে ইমেইল করো, কেমন? লেখকের ইমেইল ঠিকানা হচ্ছে: pritish.baul@brac.net)

সিঙ্গাপুরে ছোটোদের উৎসবে

আশিক মুস্তাফা

টারমাকে বসে আছে বিমান। আমার বোর্ডিং শেষ আগেই। এখন অপেক্ষা বিমানে ওঠার। তারপর উড়াল! দিন হলে যাত্রীরা পেছনে বিমান রেখে সেলফি তুলত। কিন্তু এখন পারছে না। সবাই চুপচাপ। চোখে রাজ্যের ঘুম। মনে হচ্ছে কেউ যেন সবার নাকে ক্লোরোফোমের ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়েছে। ঘুমে একেবারে অজ্ঞান হওয়ার দশা! ডিপার্চার লাউঞ্জেও মানুষ তেমন একটা নেই। বলা যায়, জার্নিটা ভালোই হবে! মানে, আরাম-আয়েশ করে বিমানে বসা যাবে। চাইলে সিটও পরিবর্তন করা যাবে।

আমি আশপাশে ইতিউতি তাকাই। ছোট্ট কাউকে খুঁজি। হঠাৎ এক পিচ্চি এসে বলে, 'আই নো, ইউ আর গোয়িং টু সিঙ্গাপুর'।

আমি মাথা নেড়ে বলি, 'ইউ আর সো ইন্টেলিজেন্ট; ইয়া, আই অ্যাম গোয়িং টু সিঙ্গাপুর। বাট হাউ ইউ নো, আই অ্যাম গোয়িং টু সিঙ্গাপুর?'

সে পণ্ডিতসুলভ একটা হাসি দিয়ে আমার গা ঘেঁষে বসল। তারপর গল্প জুড়ে দিল। বিমানের গল্প। আর তার মনে যে খুব কষ্ট সেটাও মুখে ফুটিয়ে তুলল। এই গভীর রাতে বিমানে বসে সে মেঘ দেখতে পারবে না। বিমানের জানালায় নাক ডুবিয়ে সে মেঘ দেখে।

তাকে বললাম, আমারও মেঘ দেখতে ভালো লাগে। আমি একবার বিমানের জানালায় মেঘের ঘোড়া

দেখেছিলাম। একটা-দুটো নয়। একদল সাদা ঘোড়া। পাখাওয়ালা। পক্ষিরাজ! আরেকবার রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলাম। তাকে এসব বলতে সে বলল, 'আমি তো এমন প্রায়ই দেখি।' তারপর সে বলে, 'জানো, মাঝেমধ্যে কালো মেঘের দল এসে বিমানের সঙ্গে ধাক্কা খায়। আর অমনি বিমান নড়েচড়ে ওঠে। একদিকে হেলে যায়। এতে আমার মনে ভয় মাখা একটা ভালো লাগা কাজ করে।'

আমি তো থ! আকাশে বিমান হেলেদুলে উঠলেই আমি পারি না মা-গো-ও, বাবা-গো-ও বলে চেঁচিয়ে বিমান থেকে প্যারাসুট ছাড়াই বেরিয়ে পড়ি! আর তার কি-না ভালো লাগে। সে যাক, ছোট্টমোট্ট মানুষটার মতো আমারও কিছুটা মন খারাপ। কারণ একই। মেঘ। রাতে বিমানে চড়া আর অন্ধকার ঘরে বসে থাকা একই! চলো, এবার ছোট্ট মানুষটার গল্পে ঢুকি, অনেক আগে সে মালয়েশিয়ান এয়ারলাইনসে চড়ে জাপানের নারিতা বিমানবন্দরে গিয়েছিল। পথে ট্রানজিট নিয়েছিল মালয়েশিয়ায়। আমি মনে মনে ভাবি, আরে, আমিও তো একবার নারিতা গিয়েছিলাম মালয়েশিয়ান এয়ারওয়েজে। জাপানের টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজে অনুষ্ঠিত বঙ্গবিদ্যা সম্মেলনে যোগ দিতে। মালয়েশিয়ান এয়ারওয়েজের বি-৭৩৭ সিরিয়ালের ৮০০ ভার্সনের বিমানে। ঠিক তার কিছুদিন আগে একই সিরিয়ালের দুটি বিমান উধাও হয়ে গিয়েছিল! তাই বিমানসহ হারিয়ে যাওয়ার একটা ভয় আমার মনেও ছিল। সেই ভয় নিয়েই বিমানে চড়েছিলাম। তবে ছোট্টমোট্ট মানুষটা নিশ্চয়ই এসবে ভয় পায় না। সে গল্প বলে যায়, পথে ট্রানজিট নিয়েছিল মালয়েশিয়ায়। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা জার্নি করে ঢাকা থেকে মালয়েশিয়া বিমানবন্দরে পৌঁছায়। বিমানবন্দরে দু'ঘণ্টা থেকে ফের নারিতার বিমানে ওঠে। এয়ার হোস্টেস খাবার দিয়ে যান। খাবার তার পছন্দ হয় না। কেবল সসেজটাই ভালো লাগে তার। তাই আরো সসেজ খেতে ইচ্ছে হলো। কী করা? বিমানে তো দোকানও নেই। এয়ার হোস্টেস পাশ দিয়ে যেতেই সাহস করে বলল, 'হ্যালো, ক্যান আই হ্যাব অ্যানি সসেজ?' এয়ার হোস্টেস ভুবন ভোলানো একটা হাসি দিয়ে বলল, 'ও ইয়া, চস্যা-এ-এ-জ?'

সেও একটু টেনে বলল, 'ইয়া, চসে-এ-এ-এ-জ!'

'ওকে, জাস্ট অ্যা মিনিট ওয়েট। আই অ্যাম কামিং।'

এই বলে চলে গেল। ওমা, একটু পরেই এয়ার হোস্টেস তিনটা সসেজ হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'ইফ ইউ ওয়ান্ট অ্যানাদার চসে-এ-এ-জ দ্যান কল মি বেবি!'

খুশিতে আটখানা হয়ে হাবুক-কাবুক খাওয়ায় মন দিলো সে...।

তার গল্প চলছে। এর ভেতর ডিপার্চার লাউঞ্জ ছেড়ে আমরা টারমাকের দিকে হাঁটা ধরলাম। বাবা-মায়ের সঙ্গে ছোট্টমোট্ট মানুষটিও। বিমানে আমি সবসময় জানালার পাশে সিট নেওয়ার চেষ্টা করি। চাইলে তোমরাও জানালার পাশে সিট নিতে পারো। কীভাবে? বলি, শোনো, যখন এয়ারপোর্টে ঢুকে সিট ফাইনাল করবে তখন আস্তে করে তাদের বলবে, 'ক্যান আই হ্যাভ উইন্ডো সিট পিজ?' দেখবে তারা তোমার মুখের দিকে চেয়ে জানালার পাশের সিটটাই তোমাকে দিয়ে দেবে। এই গোপন কথাটা বড়োদের বলবে না কিন্তু!

তো জানালায় বসে দূরের ফ্লাড লাইটের আলো দেখি। আর কেন যেন আমার মনে পড়ে যায়, ফরাসি লেখক আন্দ্রোয়া দ্যু সা জুপেরির ছোট্ট রাজপুত্রের কথা। তার

গ্রহের কথা। বিমান উড়াল দিল। যেন ছোট্ট রাজপুত্রের সেই গ্রহের দিকে। যেখানে সে তার গোলাপ গাছ নিয়ে আনন্দে দিন কাটাত!

শিশুসাহিত্য ও স্বপ্ননগরীর গল্প

দেশ ছেড়ে আসার আগেই অনলাইনে সিঙ্গাপুর সম্পর্কে রাজ্যের ধারণা নিয়ে এসেছি! ইউটিউবে কয়েকবার সিঙ্গাপুর সিটি ঘুরে দেখেছি। কিন্তু সরাসরি যখন সিঙ্গাপুরের চাঙ্গি এয়ারপোর্টে নামলাম তখন সব যেন কেমন কেমন লাগতে শুরু করল। যা দেখি তাই ভালো লাগে। জানো, লাইটের আলোও আমার ভালো লেগে যায়! আস্তে আস্তে হাঁটি। চোখ বড়ো করে সব দেখতে থাকি। এয়ারপোর্ট থেকে ৩২ ডলার দিয়ে ইন্টারনেট প্যাকেজসহ একটা সিম কিনে নিই। নেট ওপেন করি। তারপর গুগল মামার সহযোগিতা নিয়ে এয়ারপোর্টের নিচে যেতে থাকি চলন্ত সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। এরপর বিশেষ মেশিন থেকে নিজেই মেট্রোরেলের টিকিট কেটে বসে বসে চারদিক দেখি। আমার চোখেমুখে কৌতূহল। এই প্রথম সিঙ্গাপুর ভ্রমণ। বসে আছি ট্রেনের অপেক্ষায়। আরো দুজন এসে বসল পাশে। গল্প করতে চাইল। কথায় কথায় গল্প জমল। আমরা এক পথেই যাব। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল লাইব্রেরির দিকে। পথে ট্রেন পরিবর্তন করতে হবে। তারা দুজন ইন্দোনেশিয়ার। রিজকি ও রিনাল্ডে।

১৭ তারিখ থেকে শুরু হলো আমাদের উৎসব। এশিয়ান ফেস্টিভ্যাল অব চিল্ড্রেন'স কন্টেন্ট। সারাবিশ্ব থেকে শিশুসাহিত্যিকরা এসেছেন। শিশুসাহিত্যের সঙ্গে জড়িত এমন প্রকাশক, আর্টিস্ট এবং অনুবাদকরাও। বাংলাদেশ থেকে আমি। আর্টিস্ট শামীম আহমেদ এসেছেন শ্রীলঙ্কা থেকে। গিয়েছেন একটা এনজিওর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ১৭ থেকে ১৯ তারিখ তিনদিন টানা বিভিন্ন ক্লাস করে আমি অনেকটা হাঁপিয়ে উঠেছি। এর ভেতর অস্ট্রেলিয়ার জুলি গ্রিন, ইন্দোনেশিয়ার আফিয়ন ক্রিশ্চিয়ান, মালয়েশিয়ার নোভেল আকবর, কেনিয়ার ওয়াকানি হফম্যান, ভারতের মনিকা, আমেরিকার মার্ক চেকলে, ইসরাইলের মন্তি অভিরামের সঙ্গে আমার খুব ভাব হলো। সময় পেলেই আমরা একসঙ্গে গল্প করি। তাদের ছোটোবেলার গল্প শুনি। তাদের দেশের ছোটোদের মজার ঘটনা বলে। শিশুসাহিত্য নিয়ে নানা পরিকল্পনার কথা বলে। সব শুনি। শুনতেই ভালো লাগে। এক সময় তারা আমাদের ছোটোদের গল্প শুনতে চায়। বলি, তোমাদের মতো আমাদের ছোটোরা অত সুযোগসুবিধা না পেলেও তারা অনেক ভাগ্যবান। বলে, 'কীভাবে?'

বলি, আমরা প্রাকৃতিকভাবে ছয়টি ঋতু পেয়েছি। আমাদের ছোটোরা বর্ষা এলেই ব্যাঙের সঙ্গে মিতালি

করে। বৃষ্টি গায়ে মেখে রবীন্দ্রনাথের গান গায়। বর্ষায় আমাদের নদীগুলো জলে একাকার হয়ে যায়। ছোটোরা সেই নদীর পাড়ে জল-কাদায় এখনও ফুটবল, কাবাডি, গোল্লাছুট খেলে। তারা সবাই অবাক হয়ে আমার কথা শুনে। বলে, 'বাহ, তোমাদের দেশে তো যেতে হয়!' আমি বলি, সবসময় আমাদের ছোট্ট সোনালি দেশ তোমাদের বরণ করে নিতে প্রস্তুত। তারপর তাদেরকে বাংলাদেশ সরকারের ওয়েবসাইট খুলে দেখাই। তারা অভিভূত হয়।

২১ তারিখ ফেস্টিভ্যাল শেষ হয়। ২০ তারিখ আমরা সিঙ্গাপুরের দুটো স্কুল দেখতে যাই। একটা স্কুল সেন্ট জেমস চার্চ কিন্ডারগার্টেন। খুবই পুরনো স্কুল। অন্যটি অ্যাং মো কিও প্রাইমেরি স্কুল। এটা কিছুটা নতুন। দুটো স্কুলই আমার খুব ভালো লাগে। মিথ বলে, 'তোমাদের স্কুলগুলোও এমন?' বলি, না। তবে আমাদের বাচ্চাগুলো এদের চেয়েও মেধাবী! সে অবাক হয়। তারপর আমি তাকে আমাদের মাইজদিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের বুদ্ধিমত্তার একটা গল্প শোনাই। সে অবাক হয়ে শোনে। আর বলে, 'তাকে গিয়ে স্যালুট জানিও।'

২১ তারিখ সন্ধ্যায় সিঙ্গাপুরের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী ড. ভিভরি বালাকৃষ্ণ এলেন। আমাদের কিছু উপঢৌকন দিল ইন্দোনেশিয়ার সরকার। সামনে আবারো এই উৎসবে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হচ্ছে।

এর ভেতর চলছে ডিনার। সবাই খাচ্ছে আর আমি গল্প করছি ইন্দোনেশিয়ার বন্ধু রিজওয়াকের সঙ্গে। সে একটা স্কুলে গণিত পড়ায়। তার ছাত্রছাত্রীদের গল্প বলে। খুব ভালো লাগে সে-সব গল্প। সে আমাকে ইন্দোনেশিয়া যেতে বলে। তার স্কুলে নিয়ে যেতে চায়। বলে, 'তুমি তো অনেক ছোটো, তারা তোমার মতো একজন ছোটো লেখক পেলে খুব মজা পাবে।'

এই বলে সে হেসে উঠে!

আমি বলি, যাব। তোমাদের জাভা দ্বীপ দেখার খুব ইচ্ছে আমার। সে আমাকে জাভা দ্বীপ ঘুরিয়ে দেখানোর কথা বলল। আমিও তাকে বাংলাদেশে আসতে বললাম। আমাদের কক্সবাজার, সুন্দরবন ঘুরিয়ে দেখানোর কথা বললাম। এক সময় অনুষ্ঠান শেষ হয়। মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পাঁচ দিনে

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা যাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো আজ থেকে তারা অনেক দূরে চলে যাবে।

এর ভেতর সিঙ্গাপুরের আলোচিত কার্টুনিস্ট জেএফ কহ এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'মন খারাপ করে না বন্ধু। আমাদের যোগাযোগ হবে অনলাইনে।' ঠিকই। তাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ চলতে থাকে। প্রায়ই কথা হয় বিভিন্ন দেশের শিশুসাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে।

পরদিন বাংলাদেশি কয়েক বন্ধুর সঙ্গে সিঙ্গাপুর ভ্রমণে বের হই। ফেসবুক অফিস দিয়ে শুরু সিঙ্গাপুর ঘোরা।

দুপুরের দিকে আমরা শহর ঘোরার জন্য ডাক নামে একটা হাঁসের পিঠে চেপে বসি। সেই হাঁস শহরের রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরে-টুরে সোজা আমাদের নিয়ে পানিতে নেমে যায়। মেরিনা বে রিসোর্টের পানি গায়ে লাগতেই দেশের কথা মনে পড়ে যায়।

আর কী মনে পড়ল সেদিন? থাক সেসব কথা। এবার তোমাদের বলি, চাইলে এই উৎসবে তোমরাও যোগ দিতে পারো।

কীভাবে?

www.afcc.com.sg –এই লিংকটায় ক্লিক করে। গুগল মামা সব বাতলে দেবে।

আর হ্যাঁ, সিঙ্গাপুর গিয়ে দেশটাকে ঘুরে না দেখে দেশের বিমানে উঠবে না কিন্তু।

সেই স্বপ্নপুরীর গল্প ঘুরে এসে তোমরা জানিও নবারুণের পাঠক বন্ধুদের। কেমন?

এই গপ্‌পে কিছু ছবি আছে রং ছাড়া। তুমি রং দেবে তো, ভাই।

নিপুর রঙিন একদিন

নিশাত সুলতানা

নিপুর বয়স পাঁচ বছর। সবে ইশকুল শুরু করেছে। নতুন আপা খুব ভালো। কিন্তু একটি বিষয় মোটেই ভালো না। আর তা হলো রং চেনা।

লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো, সাদা কত রং!

কালো আর সাদা রং খুব সোজা। নিপু জানে, তার চুলের রং কালো। আর দাদির চুলের রং সাদা। তবে লাল, নীল, হলুদ আর সবুজ রং খুব কঠিন। কিছুতেই মনে থাকে না।

নিপু মন খারাপ করে বাড়ি চলল। বাড়ির পথে ছিল পেয়ারা বাগান। তার এক পাশে ডালিম গাছ। ডালিম গাছে ফল ধরেছে। কি দারুণ ওদের রং! মনে হয় পেকে গেছে! পাকা ফলগুলোর রংটা যেন কী ! কিছুতেই মনে আসছে না।

নিপু কাঁদতে শুরু করল। বসে পড়ল একটি পেয়ারা গাছের নিচে। হঠাৎ উড়ে এল একটি রঙিন প্রজাপতি। বলল, 'কাঁদছ কেন নিপু?'

নিপু তাকে খুলে বলল মনের কথা। প্রজাপতি তাকে বলল, 'আমি তোমার বন্ধু। এসো আমার সাথে। আমি তোমাকে রং চেনাবো।'

নিপু তার সামনে একটি ফুল বাগান দেখতে পেলো। প্রজাপতি তাকে নিয়ে গেল সূর্যমুখীর কাছে। বলল, 'নিপু, তুমি কী এই রংটা চেনো? তুমিও এই রংটি পরে আছো। বলো তো কোথায়?'

হেসে উঠল নিপু। তার জামার রং আর সূর্যমুখীর রং একদম এক! প্রজাপতি বলল,

'এইটা হলুদ রং।'

একটু এগিয়ে গেল নিপু। সেখানে শুধু গোলাপ আর গোলাপ। প্রজাপতি বলল, 'এই রংটাও তো তুমি পরে আছো। বলো তো কোথায়?'

নিপু আবার খুঁজতে শুরু করল; খুঁজে পেলো না। প্রজাপতি বসল নিপুর চুলের ফিতায়। বাতাসে উড়ে গেল ফিতাটি। পড়ল একটি গোলাপ গাছের উপর।

গোলাপের রং আর ফিতার রং মিলেমিশে একাকার! প্রজাপতি বলল, 'বলো তো এই রঙের নাম কী?'। নিপুর মনে পড়ল, রংটির নাম লাল।

খুশিতে নিপু দৌড়ে গেল আরেক দিকে। সেখানে বড়ো বড়ো সব গাছ। ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল নিপু। প্রজাপতি উড়ে এল তার কাছে। বলল, 'তুমি ঘাসের রঙের নাম জানো?' নিপু বলল, 'নীল'।

প্রজাপতি হেসে বলল, 'হয়নি।'

হয়নি!

প্রজাপতি বলে, 'উপরে তাকাও। আকাশ দেখতে পাও? আকাশের রং নীল। আর ঘাসের রং সবুজ। কী সুন্দর রংটা, তাই না?'

নিপু বলল, 'তার মানে গাছের পাতার রং সবুজ।' প্রজাপতি বলল, 'বাহ! নিপু, খুব ভালো।' এরপর প্রজাপতি ডেকে আনল তার সাথিদের। তারা নিপুকে পেয়ে খুব খুশি। সবাই মিলে অনেক মজা করল।

হঠাৎ ঝমঝম করে শুরু হলো বৃষ্টি। চমকে উঠল নিপু। ও মা সেকি! কোথায় গেল বন্ধু প্রজাপতি! কোথায় গেল বাগান! সে তো বসে আছে পেয়ারা গাছের নিচে। আর তার সামনে লাল লাল ডালিম। লাল রং চিনতে পারল নিপু।

নিপু বুঝল, সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর স্বপ্ন দেখছিল। প্রজাপতির জন্য খুব মন খারাপ হলো তার। কিন্তু সে খুশিও হলো। কারণ প্রজাপতি তাকে রং চিনিয়ে দিয়েছে। নিপু তাই খুব খুশি। সে নাচতে নাচতে বাড়ি চলল।

নিমুর গল্প

চন্দনকৃষ্ণ পাল

পরিচয় পর্ব

নিমু হচ্ছে ওদের পরিবারের বড়ো ছেলে। তার ঠাটবাটই আলাদা। অল্প বয়সে একটু বেশি স্মার্ট। নিমুর অন্য দুই ভাইবোন ওর চাইতে বেশ ছোটো বলে নানা কাজে নিমুর ডাক পড়ে বেশি। বাবা একা মানুষ বলে টুকটাক নানা কাজে নিমুর ওপরই নির্ভর করেন। নিজেদের কিছু ক্ষেতখামার, গোয়ালে গরু, দুটো পুকুর এসব নিয়েই নিমুদের সংসার। গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে থানা শহর। শহরে বাবার একটা ছোটোখাটো কাপড়ের দোকান। বাবা আর কলি কাকা দোকান চালান। ক্ষেতখামার, পুকুর, গরু-বাছুর দেখার জন্য আছে অনু কাকা। অনু কাকা রক্ত সম্পর্কের কেউ না হলেও নিমুর সব আবদার অনু কাকার কাছেই। অনু কাকাও ওকে ভীষণ আদর করেন। গত জানুয়ারিতে ক্লাস এইটে উঠেছে নিমু। রেজাল্টও বেশ ভালো। একটা বাইসাইকেল চেয়েছিল। বাবা পরিষ্কার জানিয়েছেন ক্লাস নাইন থেকে টেনে ভালো রেজাল্ট নিয়ে উত্তীর্ণ হলে তবেই সুপার একটা বাইসাইকেলের মালিক হবে নিমু। অতএব এখন পা-ই ভরসা। সাথে ভারি ব্যাগ থাকলে তখন রিকশা ভাড়া বরাদ্দ থাকবে। নিমু জানে বাবার কথাই ফাইনাল। পৃথিবীর সব পালটাবে কিন্তু বাবার কথা পালটাবে না।

সবুজ-শ্যামল গ্রামের ছবি

নিমুদের গ্রামটা অদ্ভুত সুন্দর। তোমরা বলতেই পারো, আরে বাবা, সবার গ্রামই সুন্দর। এটাও সত্যি। তবে কিনা নিমুদের গ্রামের একটা বিশেষত্ব আছে। তাদের গ্রামের পূর্ব প্রান্তে দাঁড়ালে পাহাড় দেখা যায় আর পশ্চিমে দাঁড়ালে হাওর। পাহাড় মানেই কালচে সবুজ গায়ে মেখে আকাশকে হাতছানি আর হাওর মানে বিস্তৃত জলরাশি বুকে ধরে স্থলভাগকে আমন্ত্রণ। তবে বিভিন্ন ঋতুতে পাহাড়, হাওর আর নিমুদের গ্রামের চেহারাও পালটে যায়। এই যেমন বর্ষায় সারা গ্রাম

সবুজ আর সবুজ। পাহাড় থেকে নেমে আসে প্রবল স্রোত। মাঝে মাঝে সেই স্রোত দু পাড় ডুবিয়ে ধানি জমির উপর দিয়ে গ্রামের নিচু জমি ভাসিয়ে দিয়ে হাওরের পানে ছুটতে থাকে। গ্রামের পূর্ব-পশ্চিম দু'দিকেই মাঠ। বৈশাখ থেকে ভাদ্র আবার ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণে মাঠের রূপ সবুজ থেকে সোনালি। শীতে আবার সারা মাঠ জুড়ে বাতাসের হাহাকার। খালি মাঠে ধানের গোড়া পড়ে থাকে। সকালে হালকা কুয়াশার সাথে সোনালি রোদের ভালোবাসা। গ্রামের ঠিক পূর্ব পাশে বিশাল পদ্ম দিঘি। পদ্ম দিঘি নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে নিমু। কিছু গল্প তো একেবারে শরীরের লোম খাড়া করা। বর্ষার জলে টইটম্বুর পদ্ম দিঘির সারা শরীর জোড়া পদ্ম ফুলের মেলা আর পদ্মের গন্ধ। ফুল যখন শেষ হয়ে আসে তখন পদ্ম পুকুরের আরেক রূপ। পদ্মের বীজ পেকে উঠলে ঠনা খেতে কী মজা। আবার শেষ চৈত্রে পদ্ম যখন মাটির নিচ থেকে ছোট্ট দুটো পাতা তুলে পানি থেকে দাঁড়ায় তখন পদ্ম মূল খেতে কী যে মজা!

গা ছমছমে মহাশ্মশান

গ্রামের পূর্ব-উত্তর কোণে পদ্ম পুকুরের গা ঘেঁষেই বিশাল শ্মশান। অনু কাকার কাছ থেকে নিমু জেনেছে কয়েক শত বছরের পুরনো এ শ্মশানঘাট। গ্রামে যারা মারা যান তাদের এ শ্মশানে দাহ করা হয়। শ্মশান এর পাশ ঘেঁষেই গ্রামে ঢোকার রাস্তা। আশপাশে কোনো বাড়িঘরও নেই। গেটের পাশে কালিমন্দির। গ্রাম থেকে ভট্টচার্য্য মশাই প্রতিদিন এসে পুজো দিয়ে যান। সন্ধ্যায় আবার প্রদীপও জ্বালান। জায়গাটা খুবই নিরিবিলি। শ্মশানের ভেতরে এদিক সেদিক ছড়ানো অনেকগুলো বিশাল বিশাল তালগাছ। তালগাছে বাবুই আর শকুনের বাসা। মাঝে মাঝেই রাতের বেলা শিশুর কান্নার মতো কান্না শোনা যায়। মা বলেছেন এ কান্না আসলে শকুন শিশুর। অন্ধকারে মাকে না দেখে হঠাৎ হঠাৎ শকুন শিশু মানুষের গলায় কেঁদে ওঠে। বছরে একবার মহা ধুমধামে কালীপূজা হয়। সারারাত হ্যাজাক জ্বালিয়ে কীর্তন করে গ্রামের লোকজন। মধ্যরাতে পূজা হয়। পাঠা বলি হয়। নিমু যায়নি কখনো। বাবা বলেন ছোটো মানুষ ভয় পাবে। দীপাবলিতে শ্মশানঘাটে সারি বেঁধে প্রদীপ জ্বালানো হয়। প্রদীপের আলো অমাবস্যার অন্ধকারকে যেন আরো গাঢ় করে তুলে। শ্মশানঘাট নিয়ে অনেক গল্প শুনেছে নিমু। সবই ভয়ের। তাই রাতে ও কখনোই একা ঐ পথে আসা-যাওয়া করে না। রাতে শ্মশানের কথা চিন্তা করলে ওর গা ছমছম করে। কেন যে এমন হয় ও বুঝতেই পারে না। একবার নাকি গ্রামে ডাকাত পড়েছিল। নিমু তখন খুবই ছোটো। পরে জানা গেল যে শ্মশানে বসেই রাত গভীর হওয়া পর্যন্ত ডাকাতরা অপেক্ষা করেছিল। ডাকাত পড়ার পর পরই অনু কাকা টের পায়। আর তক্ষুণি গ্রামের সকল ঘরে খবরটা পৌঁছে দিয়েছিল। গ্রামের সব পুরুষ মানুষ মশাল আর লাঠি, সড়কি, বর্ষা নিয়ে গ্রামের চতুর্দিকে ঘেরাও দিয়ে দেওয়ায় সেবার সাত জন ডাকাত ধরা পড়েছিল। পিটিয়ে আধমরা করে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল গ্রামের মানুষেরা। তারপর থেকে এ গ্রামে আর ডাকাত পড়েনি।

নিমুর রাত হয়ে যাওয়ার গল্প

বাবার বড়ো ছেলে নিমু। তাই বাবার ইচ্ছে একটু একটু করে কাজকর্ম করতে শিখুক ও। এই যেমন বাজারহাট করা। ওই দেখো বাজারহাট মানে তোমাদের কাছে বোধ হয় পরিষ্কার হলো না। আসলে সারা সপ্তাহের ডাল-তেল-লবণ-মরিচ-কেরোসিন ওসব শহর থেকে কেনে নিমুরা। আর প্রতিদিনের শাকসবজি, মাছ গ্রামের বাজার থেকে। ওদের সবজি ক্ষেত আছে। কিছু সবজি ওখান থেকেও আসে। বাবার ইচ্ছে ও কেনাকাটা করতে শিখুক। বড়ো হয়ে এ সংসারের হাল তো ওকেই ধরতে হবে। তাই মাঝে মাঝে মায়ের কাছ থেকে লিস্ট আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে বিকেলে শহরে যায় নিমু। বাবা টাকা হিসাব করে মহাবীর বানিয়ার মুদি দোকানে পাঠান। লিস্ট অনুযায়ী বাজার নিয়ে ও বাড়ির পথে পা বাড়ায়। ব্যাগ একটু ভারি হলে রিকশা ভাড়া বরাদ্দ থাকে। আর সাথে আরো এক-দুই টাকা। চিড়া-মুড়ির মোয়া নিমুর খুব পছন্দের জিনিস। ঐ এক-দুই টাকা খরচ হয় চিড়া মুড়ির মোয়া কিংবা খই এর উখড়ার পিছনে। নিমু আজকাল পাঠ্য বই এর বাইরেও অন্যান্য বই পড়ে। কাজী আনোয়ার হোসেনের কুয়াশা, প্রভাবতী দেবী স্বরস্বতীর কৃষ্ণা সিরিজ, রোমেনা আফাজ এর দস্যু বনহুর এসবই বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে অদলবদল করে পড়ে নিমু। রহস্য উপন্যাসের প্রতিও ওর প্রচণ্ড আগ্রহ। আসলে বই পড়ার নেশাও বাবার কাছ থেকে পাওয়া। বাবা প্রচুর গল্পের বই পড়েন। ঘরের ছাদে বস্তা ভর্তি গল্পের বই পেয়ে নিমুর আনন্দ দেখে কে। বাবাকে বলে বিশাল একটা বুক র‍্যাক আনার ব্যবস্থা করে ও। তারপর সব বই সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে। বাবা খুব খুশি হন। মা একটু বকা দেন মাঝেমধ্যে।

পড়াশুনার ফাঁকে ও চুরি করে গল্পের বই পড়ে। দু-একবার মায়ের হাতে ধরা খেয়ে দু-চারটি চড় থাপ্পড় হজম করতে হয়েছে। কিছুদিন আগে ঢাকা থেকে কিশোর বাংলা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের হয়েছে। অসাধারণ একটি

পত্রিকা। এতে যেমন ছোটোদের সংবাদ, খেলাধুলার খবর থাকে। তেমনি থাকে গল্প, প্রবন্ধ আর ছড়া। ছড়াও খুব মজা লাগে নিমুর। আজকাল গোপনে ও ছড়া লিখতে চেষ্টা করছে। ও জানে না ওগুলো সত্যি সত্যি ছড়া হচ্ছে কিনা। জিতেন স্যারকে একবার দেখাবে কিনা ভাবছে ও।

নিমুর প্রিয় বন্ধুদের কথা

গ্রামের বন্ধুদের মধ্যে শিমুলই ওর কাছের বন্ধু। শিমুল এখনো ওর সাথে পড়ছে। একসাথে স্কুলে যাওয়া-আসা, বই অদলবদল। শিমুলরা একটু বড়োলোক। এজন্য শিমুলের একটু অহংকার ছিল। মাঝেমধ্যে টাকাপয়সা ও দামি জিনিসের গল্প করত শিমুল। এতে একদিন খেপে যায় নিমু। এরপর থেকে শিমুলের মধ্যে একটু পরিবর্তন এসেছে। ওরা এখন খুব ভালো বন্ধু। গ্রামের অন্য বন্ধুরা প্রাইমারিতেই রয়ে গেছে। কেউ বাবাকে ক্ষেতখামারে সাহায্য করে। কেউ বাবার ব্যবসায় সাহায্য করে। ওদের সাথেও বন্ধুত্ব আছে নিমুর। স্কুল থেকে ফিরে সবার সাথে মাঠে নানান খেলায় মেতে ওঠে ও। নিমুর শহুরে কিছু বন্ধুও আছে। ওরাও পড়াশুনায় ভালো আর খুব ভদ্র। ফেরদৌস মান্নান রোজার্স ওর প্রিয় বন্ধুর একজন। রোজার্স ঢাকার বিক্রমপুরের ছেলে। ওর বাবা বাংলাদেশ টি রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। ওরা শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে। একদম রেডিওর মতো শুদ্ধ। নিমু ওদের ভাষা খুব পছন্দ করে। ও খুব অবাক হয়ে দেখে ওদের মুখের ভাষা আর বইয়ের ভাষা এক। নিমুও চেষ্টা করে। কিছু কিছু হয়। কিন্তু মাঝেমধ্যে আঞ্চলিক সুরটা চলে আসে। বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ খেপায়। নিমু বলে চেষ্টা তো করি, একদিন নিশ্চয়ই ভালো হবে। রোজার্স ওকে উৎসাহ দেয়। গৌতম বুদ্ধের মতো শান্তশিষ্ট যে বন্ধুটি তার নাম গৌতম চক্রবর্তী। গৌতম খুব কম কথা বলে। ও হচ্ছে শ্রোতা বন্ধু। এক একজনের দশটা ডায়ালগ থাকলে গৌতমের একটা। বন্ধুরা ওকে খেপায় গৌতম বুদ্ধ-টু বলে। এতে মাইন্ড করে গৌতম। বলে গৌতম বুদ্ধ মহামানব, খবরদার উনার সাথে আমাকে তুলনা করবি না। গৌতমের স্বপ্ন ডাক্তার হবে। অনেক বড়ো ডাক্তার। আর গরিব মানুষদের সাহায্য করবে। এটা ওর আন্তরিক চাওয়া। কিন্তু বন্ধুরা ওকে খেপায়। বলে সাহায্য করবি? তখন পাঁচশত টাকা ভিজিট ছাড়া রোগীই দেখবি না।

গৌতম তখন আহত হয়। মন খারাপ করে। হয়ত মনে মনে বলে ঠিক আছে, বলছিস বল। কিন্তু যেদিন ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করব সেদিনই প্রমাণ হবে কার কথা ঠিক!

বাংলা স্যারের নূতন ঘোষণা

জিতেন স্যার নিমুদের বাংলা পড়ান। স্যারের পড়ানোটা অদ্ভুত। শুধু পাঠ্য বই নয়। পৃথিবীর সেরা গল্পের খনি যেন স্যার। বিশ্বসাহিত্যের অসাধারণ সব গল্প নিমুরা স্যারের কাছ থেকে শুনেছে। স্যার ছিলেন বিপ্লবী। স্বদেশি আন্দোলনে তার অনেক অবদান। একইভাবে মুক্তিযুদ্ধেও তার অনুপ্রেরণার শেষ নেই। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই উপমহাদেশের জীবিত সকল বিপ্লবীদের যে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন জিতেন স্যারও তাদের একজন। স্যারকে নিয়ে তাই নিমুদের অনেক গর্ব।

একজন সেরা মানুষ সবাইকে সেরাটাই দিতে চেষ্টা করেন। স্যার যেমন অসাধারণ বাংলা পড়ান তেমনি ইংরেজিও। আবার বাংলা ব্যাকরণ যেমন, ইংলিশ গ্রামারও তেমনি। সবাই স্যারকে যেমন শ্রদ্ধা করে, তেমনি ভয় পায় আবার ভালোও বাসে। সেই জিতেন স্যারই ঘোষণাটা দিলেন। স্যার বললেন, আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস আমরা বিশেষভাবে পালন করব। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমরা একটি বিশেষ সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করব। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তোমাদের যা জানা আছে- তা গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, নিবন্ধ, স্মৃতিকথা আকারে লিখে নিয়ে আসবে। আমরা চাই এতে তোমরা সবাই অংশগ্রহণ করো। সেরা লেখার জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

এক নতুন উদ্যমে জেগে উঠল সারা স্কুল।

নিমুর কলমে মুক্তিযুদ্ধ

মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধের কথা মনে হলে বুকের ভেতরটা খান খান হয়ে যায় নিমুর। নিমু তখন পঞ্চম শ্রেণি থেকে ১ম স্থান দখল করে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে উঠেছে। অনেক গর্ব নিয়ে, ভিক্টোরিয়া হাই স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ক্লাশ শুরু হয়েও হচ্ছে না। বইপত্র কেনাও শেষ। নতুন বইয়ের গন্ধ ওকে পাগল করে দেয়। স্কুলে ওরা যায় ঠিকই। কিন্তু ঠিকমতো ক্লাস হয় না। স্যাররা নানান কথা বলেন। কিছু বুঝে, কিছু বুঝে না। কেমন একটা থমথমে পরিবেশ। বাবাসহ গ্রামের অনেকেই ওদের সিটিজেন রেডিওতে বিবিসি আর ভয়েস অব আমেরিকার খবর শুনতে আসেন। রেডিওর এরিয়েলটা বাবা ঘরের চালে ঠিকমতো সেট করে দিয়েছেন। এখন রেডিওর আওয়াজ অনেক স্পষ্ট। শহরে মিছিল-মিটিং হচ্ছে। স্কুলে যাওয়া বন্ধ। থমথমে পরিবেশ। মার্চ-এর শেষের দিকে শোনা গেল ঢাকায় অনেক মানুষকে মেরে ফেলা হয়েছে। দেশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। যুদ্ধের গল্প শুনেছে নিমু। যুদ্ধে নাকি গোলাগুলি হয়। বোমা ফেলে মানুষ মেরে ফেলা হয়। নিমু ভয় পেয়ে যায়। এখানেও কী তাই হবে? আকাশবাণী কলকাতা থেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত অনেক খবর দিচ্ছে। গ্রামের সবাই শুনছে। কী হয় কে জানে।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে থমথমে এক সকালে ভয়ংকর শব্দে ভরে গেল নিমুদের গ্রামের আকাশ। দুটো যুদ্ধ বিমানের ভয়ংকর শব্দে কেঁপে উঠল গ্রাম। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ভয়ংকর কয়েকটি শব্দ। গ্রামজুড়ে ভয়ার্ত চিৎকার আর কান্না। শহরের মানুষজন গ্রামের দিকে ছুটতে ছুটতে এল। অনেকেই এক কাপড়ে সীমান্তের দিকে রওয়ানা হলো। জানা গেল শহরের খাদ্য-গুদাম খুলে দেওয়া হয়েছে। শহরের লুটপাট হচ্ছে। রেলস্টেশন, কালিবাড়ি, নতুনবাজারসহ জনবহুল কয়েক জায়গায় পাকিস্তানি যুদ্ধবিমান বোমা ফেলে গেছে। অনেকে হতাহত। নিমুর বাবা ফিরে এলেন বাড়িতে। বললেন গোছগাছ করো এখনই বের হতে হবে। সামান্য কিছু জিনিসপত্র নিয়ে সীমান্তের পথে যাত্রা শুরু করল নিমুরাসহ গ্রামের আরো কিছু পরিবার। সারারাত পায়ে হেঁটে ভারতের সীমান্ত শহর কমলপুর পৌঁছালো ওরা। তারপর নয় মাসের শরণার্থী জীবন। ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে যাওয়া। সিধু কাকাসহ অনেকের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ। ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের সূর্য উঠল পূর্ব আকাশে। নিমুরা ফিরে এল স্বাধীন বাংলাদেশে। বাবার ব্যাবসায়ের কিছুই নেই। বাড়িঘর, গাছপালা সব লুট হয়ে গেছে। গাছপালা ঘেরা জঙ্গলের মতো বাড়ির মরুভূমির মতো ভিটেতে ফিরে এসে চোখের জল ফেলা ছাড়া কিছুই করার ছিল না ওদের। শহরে মাড়োয়ারিদের পরিত্যক্ত বাসায় আবার দু'মাসের জীবন ...

পুরোটাই উঠে এল নিমুর কলমে, নিমুর মুক্তিযুদ্ধের সত্য গল্পে।

রক্তসিঁড়িতে নিমুর গল্প

খুব ভয়ে ভয়ে স্যারের কাছে লেখাটা জমা দেয় নিমু। জিতেন স্যার উলটেপালটে দেখেন। তারপর বলেন নিজে লিখেছিস তো? দেখিস অন্যের লেখার কপি

হলে ভীষণ লজ্জায় পড়ে যাবি কিন্তু। নিমু স্যারকে আশ্বস্ত করে। ঠিক আছে আমি পড়ে দেখি। নিমুর ভয়টা কাটে না। ওর প্রথম লেখা ওটা। তাও জিতেন স্যারের হাতে। পড়ে স্যার যে কী বলবেন কে জানে। সারা ক্লাসের ছেলেদের সামনে অপমানজনক কিছু বললে সবাই পেট খুলে হাসবে আর নিমুকে মাটির সাথে মিশে যেতে হবে।

না, পরদিন তেমন কিছু হলো না ক্লাসে। স্যার শুধু ডেকে বললেন মুক্তিযুদ্ধের সময় তোরা কমলপুর ছিলি? আমরাও ছিলাম কিছুদিন। এটুকুই। নিমু বুঝল স্যার লেখাটা পড়েছেন। ১৬ ডিসেম্বরের খুব বাকি নেই। রাতে ঘুমের ভেতর স্বপ্ন দেখে নিমু ওর লেখা ছাপা হয়েছে। ছাপার অক্ষরে ওর নাম দেখে ভালো লাগায় ভরে ওঠে মন। ঘুমের মধ্যে চিৎকার দেয়, মা আমার লেখা ছাপা হয়েছে। মা ওর ঘুম ভাঙান, কীরে পাগল, কীসের লেখা? ঘুম ভেঙে অবাক চোখে তাকায় নিমু। লজ্জা পায়। না, কিছু না বলে আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর। স্কুলে বলে দেওয়া হয়েছে আগামীকাল খুব ভোরে স্কুলে পৌঁছাতে হবে। সকালে র‍্যালি হবে। সারা শহর ঘুরে র‍্যালি যাবে শহিদমিনারে। ওখানে ফুল দিয়ে স্কুলে ফিরে বিজয় দিবসের ম্যাগাজিন রক্তসিঁড়ির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান এবং সেরা লেখার পুরস্কার বিতরণী। এসব ভাবতে কখন যে দু-চোখে ঘুম নেমে আসে বুঝতেই পারে না নিমু।

খুব ভোরে শিমুলের ডাকে ঘুম ভাঙে নিমুর। উঠে হাত মুখ ধুয়ে তৈরি হয় ও। মা ঘরে পাতা দই, গুড় আর চিড়া দেন। খুব প্রিয় খাবার নিমুর। শিমুলও দই, চিড়া খায় নিমুর সাথে। তারপর দুই বন্ধু স্কুলের পথে যাত্রা করে। মনটা খুব ফুরফুরে লাগছে। একটা চাপা উত্তেজনা মনের ভেতর। ওর লেখাটা ছাপা হবে তো? মাঝে মাঝেই আনমনা হয়ে যায় ও। র‍্যালিতে দুই বন্ধু পাশাপাশি হাঁটে। জয় বাংলা, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ইত্যাদি স্লোগানে ভরে ওঠে শহরের বাতাস। ব্যানার, ফেস্টুন আর মাথায় বাধা বাংলাদেশের পতাকায় উজ্জ্বল র‍্যালি।

সকাল এগারোটার দিকে স্কুলে ফিরে আসে সবাই। স্কুল মাঠে পতাকা স্ট্যান্ডের পাশে মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। বিশাল শামিয়ানার নিচে ছাত্র, অভিভাবকবৃন্দ বসেছেন। সিও (সার্কেল অফিসার)সহ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত। মঞ্চে হেডস্যার, জিতেন স্যার, কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার আর সিও বসেছেন। সলিল স্যার আছেন ঘোষণার দায়িত্বে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তসিঁড়ির মোড়ক উন্মোচন হলো। মুক্তিযুদ্ধের পর প্রথম সাহিত্য সাময়িকী। ছাত্র-অভিভাবকদের মধ্যে বিতরণ করা হলো রক্তসিঁড়ি। নিমুও এক কপি পেলো। ওর বুক ঢিপ ঢিপ করছে! ওর লেখা আছে তো? টকটকে লাল প্রচ্ছদ। যেন শহিদদের রক্ত লেগে আছে। ভিতরের পাতা উলটায় নিমু। কয়েক পাতার পর ওর চোখ আটকে যায়। ওর লেখার শিরোনাম, ঠিক নিচে ওর পুরো নাম জ্বলজ্বল করছে। ছাপার অক্ষরে ওর নাম দেখে অজান্তেই লাফ দেয় নিমু। অজানা এক ভালো লাগায় বুকের ভেতরটা পূর্ণ হয়ে যায়। ওর নিজের লেখা গল্পটা আজ কতজন পড়বে!

মাইকের ঘোষণায় ও বাস্তবে ফিরে আসে। প্রকাশিত সংকলনের সেরা লেখকদের এবার পুরস্কার প্রদানের পালা। সলিল স্যার মাইকে ঘোষণা করেন। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রথম সংকলন রক্তসিঁড়ির সেরা লেখক নির্মলেন্দু পাল নিমু, তার গল্প...।

নিমু ওর নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না। ওর গল্প সেরা গল্প হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। শিমুল ওকে গুঁতো দেয়, যা স্যার তোকে মঞ্চে ডাকছেন। একটি ঘোরের মধ্যে মঞ্চের দিকে এগোয় নিমু। মঞ্চে উঠতেই জিতেন স্যার ওকে জড়িয়ে ধরেন। অসাধারণ লিখেছিস তুই। সিও ওকে পুরস্কৃত করেন। তারপর ওর অনুভূতি জানতে চান। ও মাউথ স্পিকারের সামনে দাঁড়ায় জীবনের প্রথম। ও জানে না ও কী বলবে। তবু মনের মধ্যে সাহস এনে শুরু করে। 'আমি আজ খুব আনন্দিত। আমি ভাবতেই পারিনি আমার লেখা সেরা লেখা হিসেবে বিবেচিত হবে। এ লেখার বিষয় কোনো কল্পিত বিষয় নয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরু এবং যুদ্ধ চলাকালীন শরণার্থী শিবিরের সত্য ঘটনাই আমি আমার মতো করে লিখেছি। হ্যাঁ নিজের দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যাওয়া, ফিরে এসে শূন্য ভিটে মাটি পাওয়ার কষ্টের কথাই ছিল আমার বিষয়। আমার স্যাররা আমার লেখা পছন্দ করেছেন এর চেয়ে বড়ো পাওয়া আমার আর কিছু নেই।'

আর বলতে পারে না নিমু। ওর চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল জমে যায়। ঝাপসা চোখে ও মঞ্চ থেকে নেমে আসে। মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথি এবং সামনের দর্শক শ্রোতাদের করতালিতে মুখর তখন সারা মাঠ। নিমু শিমুলের পাশে থাকা ওর আসনের দিকে এগোতে

অজিদের হারালো টাইগাররা

রওনক মারুফ শুদ্ধ

২০১৬ সালে টেস্ট পরাশক্তি ইংল্যান্ড এর পর বাংলাদেশ এবার হারালো আরেক টেস্ট পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়াকে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ক্রিকেটে যে উন্নতি করেছে তার ফল হিসেবে তারা নিয়মিত জিতে যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ডের মতো দলের বিপক্ষেও। কয়েকমাস আগে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়েছে নিজের মাঠে।

গত ২৭ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ২ ম্যাচ টেস্ট সিরিজ খেলতে ১৮ আগস্টেই বাংলাদেশে আসে অজিরা। এই সিরিজের ১ম ম্যাচ ছিল দলের দুই সিনিয়র ক্রিকেটার সাকিব ও তামিমের জন্য স্মরণীয় অর্ধশততম টেস্ট ম্যাচ। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে যায় বাংলাদেশ। দ্রুত ৩টি উইকেট হারালেও সাকিব-তামিমের ১৫৫ রানের জুটিতে ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। সাকিবের ৮৪ ও তামিমের ৭১ রানের ইনিংসে ভর করে বাংলাদেশ সব উইকেট হারিয়ে ২৬০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ম দিনে ১৮ রানে ৩ উইকেট হারায় অস্ট্রেলিয়া। ২য় দিন ব্যাটিংয়ে নেমে ২১৭ রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। অলরাউন্ডার সাকিব ৫টি ও মিরাজ ৩টি উইকেট লাভ করেন। ৪৩ রানের লিডে খেলতে নেমে দিন শেষে ৮৮ রানের লিডে ১ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ৩য় দিন তামিমের ৭৮ ও মুশফিকের ৪১ রানে ভর করে বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে সব উইকেট হারিয়ে ২৬৫ রানের লক্ষ ছুড়ে দেয়। দ্রুত ২ উইকেট তুলে নিলেও ওয়ার্নার ও স্মিথের ব্যাটিংয়ে ঘুরে দাড়ায় অস্ট্রেলিয়া, ১০৯ রানে ২ উইকেট হারিয়ে দিন শেষ করে। অস্ট্রেলিয়াকে জয়ের আশা দেখালেও সাকিবের ৫ উইকেট ও তাইজুলের ৩ উইকেটে ভর করে ২৪৪ রানেই অস্ট্রেলিয়াকে আটকে ফেলে বাংলাদেশ। ২০ রানে পরাজিত হয় অস্ট্রেলিয়া, সেঞ্চুরি করেও অস্ট্রেলিয়াকে জেতাতে পারেননি ওয়ার্নার। ১০ উইকেট (৫/৬৮, ৫/৮৫) ও ৮৯ রান (৮৪ ও ৫) করে ম্যাচ সেরা হয় সাকিব আল হাসান। এই ১০ উইকেট পাওয়ার মাধ্যমে সব টেস্ট খেলুড়ে দলের বিপক্ষেই ৫ উইকেট নেওয়ার বিরল রেকর্ড গড়েন সাকিব।

৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শুরু হয় সিরিজের ২য় টেস্ট। এই ম্যাচেও ১ম ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ ৩০৫ রানে অলআউট হয়। জবাবে ব্যাটিংয়ে নেমে শুরু থেকেই দাপটের সাথে খেলে অস্ট্রেলিয়া। এই ইনিংসে ৭২ রানের লিড নেয় অস্ট্রেলিয়া। পিছিয়ে থেকে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ সর্বসাকুল্যে সংগ্রহ করে ১৫৭ রান, ফলে অজিদের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় মাত্র ৮৬ রান। এই লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে নেমে ৭ উইকেট হাতে রেখেই ম্যাচ জিতে নেয় ক্রিকেট পরাশক্তি অস্ট্রেলিয়া। ড্র হয় ঐতিহাসিক এই সিরিজ।

নানান টাল বাহানায় অজিরা বাংলাদেশ সফরে আসতে বিলম্ব করলেও বাংলাদেশ অজিদের যোগ্য জবাব দেয়। এই সিরিজে আবারও প্রমাণিত হলো, বাংলাদেশ এখন হারাতে পারে ইংল্যান্ড, শ্রীলংকা ও অস্ট্রেলিয়ার মতো দলকেও।

নবম শ্রেণি, সেন্ট যোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

গল্প

বিকেল বেলা ক্রিকেট খেলা

রণজিৎ সরকার

কয়েকদিন পরে রাজনদের নবম শ্রেণির সাথে অষ্টম শ্রেণির ক্রিকেট ম্যাচ। ওরা কয়েকদিন হলো স্কুল মাঠে নিয়মিত প্র্যাকটিস করছে, ক্লাস শুরুর আগে আর স্কুল ছুটির পরে।

তিনদিন পর খেলা শুরু হলো। টসে জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় নবম শ্রেণির অধিনায়ক রাসেল। ফাস্ট বলার মারুফের হাতে বল তুলে দেয় রাসেল। অষ্টম শ্রেণির ওপেনিং ব্যাটসম্যান সুমন আর নাসির ব্যাট ঘুরাতে ঘুরাতে মাঠে নামল। আম্পায়ারের ইশারায় মারুফ বল করার জন্য দৌড় দিল। বল করল। কোনো রান হলো না। মারুফ প্রথম দুই বল ডট দিল। পরের বলে অষ্টম শ্রেণির সুমন চার মেরে দিল। ওদের রানের অংক ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল।

নবম শ্রেণির বোলাররা উইকেটের পতন ঘটাতে পারছে না। রাসেল এবার রাজনের হাতে বল তুলে দিয়ে বলল, 'তোকে কিন্তু পারতে হবে। উইকেটের পতন ঘটানো ছাড়া এই মুহূর্তে কোনো গতি নাই। উইকেট চাই।'

অধিনায়কের কথা শোনার পর রাজন কাটার মুস্তাফিজের কথা মনে করে বল করল। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টম শ্রেণির এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী সুমনকে বোল্ড করে দিল রাজন। ধারাবাহিকতায় ধীরে ধীরে উইকেটের পতন হতে লাগল। সবশেষে অষ্টম শ্রেণির দল বিশ ওভার খেলে পাঁচ উইকেটে ১১৯ রান সংগ্রহ করল। নবম শ্রেণির টার্গেট ১২০ রান।

নবম শ্রেণির দল মাঠে নামল। রাসেল আর হামিদ ওপেনিং ব্যাটিং করতে লাগল। রাসেল ফুল টাচের একটা বল এগিয়ে মারতে গিয়ে সে বোল্ড হয়ে গেল। নামল সজীব। সজীব এসেই ফুল টাচের একটা বল পেয়ে ক্রিস গেইলের মতো জোরে মারল। বলটা একটুর জন্য ছক্কা হলো না। এক ডপ পরে ঘুরতে ঘুরতে বল গেল মাঠের বাইরে। রান হলো চার। নবম শ্রেণির সবার মধ্যে উচ্ছ্বাস। একটু পর ওদের দলের পর পর তিন উইকেট পড়ে গেল। অষ্টম শ্রেণির রাজু হ্যাট্রিক করল। এবার অষ্টম শ্রেণির সমর্থকরা আনন্দ উল্লাসে মেতে উঠল।

অধিনায়ক রাসেল রাজনকে বলল, 'রাজন, এবার তোকে নামতে হবে। দলের বিপর্যয়ে হাল ধরতেই হবে। তুই ছাড়া রক্ষা নেই।'

রাজন ব্যাট হাতে নিয়ে বলল, 'কোনো চিন্তা করো না। আমি মাহমুদুল্লাহ্ রিয়াদের মতো ব্যাট হাঁকিয়ে দলকে জেতাব।'

রাজনের কথা শুনে রাসেল সাহস পেল। রাজন পর পর তিনটা চার- দুটা ছক্কা মারল। নবম শ্রেণির সবাই খুশিতে হাততালি দিচ্ছে। রাজনের সাথে জুটি বেঁধেছে রেদওয়ান। এই জুটি ৩০ রান করেছে। দলের রান হয়েছে ১০০। আর ২০ রানের দরকার। হাতে আছে দুই উইকেট। রেদওয়ান একটু মোটা। দৌড়ে রান নিতে গিয়ে সে রান আউট হয়ে গেল। হাতে আর এক উইকেট। ভরসা শুধু রাজন। রাসেল এসে রাজনের পিঠে হাত রেখে সাহস দিয়ে বলল, 'রাজন, তোকে কিন্তু পারতেই হবে।'

রাজন বলল, 'আমি নিজের জন্য খেলি না। দলের জন্য খেলি। জয়ের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব।' রাজন শেষ জুটি বাঁধবে ফুয়াদের সাথে। ফুয়াদের কাঁধে হাত

রাখল রাজন। তারপর সে ধীরে ধীরে ফুয়াদকে কী যেন বলতে বলতে নিয়ে গেল ক্রিজে। ব্যাট হাতে দুজন দাঁড়াল দু পাশে। ফুয়াদ প্রতিপক্ষের বল মোকাবিলা করার জন্য দুরু দুরু বুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অষ্টম শ্রেণির ফিল্ডারের কড়া দৃষ্টি দুই ব্যাটসম্যানদের উপর। ফুয়াদ চোখ বন্ধ করে একটা বলকে পেটালো। বলটি মাটি কামড়ে চার হয়ে গেল। আম্পায়ার হাত প্রসারিত করে চার রানের ঘোষণা দিলেন। ফুয়াদের চার মারা দেখে সবাই অবাক। গ্যালারি থেকে অনেকে বলছে– ফুয়াদ ফুয়াদ, এগিয়ে যাও, আমরা আছি সাথে।'

নবম শ্রেণিদের প্রয়োজন ছয় বলে ছয় রান। স্ট্রাইকে আছে ফুয়াদ। মাশরাফির মতো করে বল করল অষ্টম শ্রেণির সজল। কিন্তু ব্যাট হাতে নিয়ে বলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে বলটাকে পেটালো। বল ব্যাটের টাইমিং ভালো হয়নি। বল

'রাজন, এবার তোকে নামতে হবে। দলের বিপর্যয়ে হাল ধরতেই হবে। তুই ছাড়া রক্ষা নেই।'

বেশি দূর গেল না। এই ফাঁকে ব্যাটসম্যান দুইজন একবারের জন্য তাদের জায়গা বদল করল। এক রান সংগ্রহ হলো। কিন্তু আরো পাঁচ বলে পাঁচ রান প্রয়োজন। রাজন এবার স্ট্রাইকে। সজল বল করল। রাজন চোখমুখ অন্ধকার করেই ব্যাট হাঁকালো। বলটা উপর দিয়ে সীমানার বাইরে পড়ল। আম্পায়ার দুই হাত উপর দিকে উঁচু করে ছক্কার ঘোষণা দিলেন। জয় নিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠের বাইরে থেকে দৌড়ে এসে রাজনকে নিয়ে নবম শ্রেণির সবাই আনন্দ-উল্লাস করতে লাগল।

গাছগুলো সব অদ্ভুত

নাবীল অনুসূর্য

আমাদের পরিবেশ ও প্রকৃতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হলো গাছ। গাছদের কেন্দ্র করেই প্রাণের ও প্রাণীর সমাবেশ ঘটে। গাছ ছাড়া প্রাণীদের পক্ষে বেঁচে থাকাই মুশকিল। তাই যেখানে গাছ বেশি, বন গভীর, সেখানে প্রাণীদের সংখ্যাও বেশি, বৈচিত্র্যও প্রচুর।

তবে গাছেদের নিজেদের মধ্যেও কিন্তু বৈচিত্র্য কম নেই। পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে, যেগুলোকে সামনাসামনি দেখলেও সত্যি বলে বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় কোনো স্বপ্নলোকের বৃক্ষ বোধ হয়। কোনোটা দেখতেই এত অদ্ভুত, আবার কোনোটা এমন অদ্ভুতভাবে বেঁচে আছে, রীতিমতো পিলে চমকে দেওয়ার মতো।

অ্যাক্সেল এরল্যান্ডসনের গাছ-ভাস্কর্য (আমেরিকা)

গাছের প্রতি অ্যাক্সেল এরল্যান্ডসনের দুর্বলতা ছিল ভীষণ। তাই সবাই যখন ভাস্কর্য গড়তে কাদা-মাটি, চুন-সুরকি-সিমেন্ট কিংবা রড-স্টিল-অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করে, তিনি সেখানে গাছেদের দিয়ে জীবন্ত ভাস্কর্য বানানোর চিন্তা করলেন। ফল হলো শ্বাসরুদ্ধকর। তার গাছ-ভাস্কর্যগুলোর জন্য আলাদা একটা শব্দই বানানো হলো- আরবরস্কাল্পচার। ১৯৪৭ সালে এরল্যান্ডসন তার এই গাছ-ভাস্কর্যগুলো সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। তারপর থেকেই ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজের এই গাছগুলো দেখতে মানুষের ঢল চলছেই। হবে না-ই বা কেন, যদি জীবন্ত গাছ দিয়ে ঝুড়ি, বোতল, নৃত্যরত মানুষ- যা-ইচ্ছা-তাই বানানো হয়!

সবচেয়ে মোটা তুলি গাছ (মেক্সিকো)

দানব-আকৃতির এই তুলি গাছ মেক্সিকোর সবচেয়ে বিখ্যাত গাছ। ভালো নাম 'মন্টেজুমা সাইপ্রেস'। জন্মো দেশটির ওহাকা অঞ্চলের তুলি শহরে। ওখানে দুই হাজার বছরের বুড়ো তুলি গাছও আছে। অবশ্য এই গাছগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বুড়ো গাছের তালিকার শীর্ষে উঠতে পারেনি। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা গাছের তালিকাতেও শীর্ষে নেই তুলি। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে মোটা গাছের তকমাটা ঠিকই বাগিয়ে নিয়েছে। সবচেয়ে মোটা প্রজাতির এই গাছেদের মধ্যে সবচেয়ে প্রশস্ত যেটা, সেই তুলি গাছের পরিধি প্রায় ১৬৪ ফুট!

> 'পৃথিবীতে এমন অনেক গাছ আছে, যেগুলোকে সামনাসামনি দেখলেও সত্যি বলে বিশ্বাস হতে চায় না। মনে হয় কোনো স্বপ্নলোকের বৃক্ষ বোধ হয়।'

ড্রাগন ট্রি (ক্যানারি আইল্যান্ডস)

অদ্ভুতুড়ে আকৃতির এই ড্রাগন ট্রির দেখা মেলে ক্যানারি আইল্যান্ডসের টেনেরিস দ্বীপে। ইয়েমেনের দ্বীপ সকোত্রাতেও এর দেখা পাওয়া যায়। গাছগুলোর বয়সও আছে অনেক। একেকটার বয়স সাড়ে ছয়শ থেকে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত। এই গাছগুলো কেবল দেখতেই অদ্ভুত না, এদের নামের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে পৌরাণিক এক কাহিনি।

একবার হারকিউলিসকে স্বর্গের হেসপেরিদেস নামের এক বাগান থেকে তিনটি সোনার আপেল নিয়ে আসতে হয়েছিল। সেগুলো পাহারা দিত ল্যাডন নামের এক ড্রাগন। তার ছিল একশটা মাথা। আপেল আনতে গেলে, হারকিউলিসের সঙ্গে মারামারি বেঁধে যায় ল্যাডনের। সেই মারামারিতে হারকিউলিসের হাতে প্রাণ যায় ল্যাডনের। তখন ল্যাডনের যে রক্ত ঝরে পরেছিল পৃথিবীতে, সে-সব রক্ত থেকেই এই ড্রাগন ট্রির জন্ম। এমনকি ওই গাছগুলো কাটলে নাকি ড্রাগনের রক্তও বের হয়।

ট্রি অফ লাইফ (বাহরাইন)

ছোট্ট দ্বীপ দেশ বাহরাইন। পৃথিবীর নিঃসঙ্গতম গাছটি এই দেশেই অবস্থিত। ধু-ধু মরুভূমিতে একেবারেই একা দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। সেও প্রায় ৪০০ বছর ধরে। এই 'মেসকুইট' গাছটি যে কেবল ৪০০ বছর ধরে একাই বেঁচে আছে, শুধু তাই না। দিব্যি বেঁচে আছে কোনো পানি ছাড়াই। গাছটা যেখানে অবস্থিত, সেখানে পানির কোনো অস্তিত্বই নেই। আর সে জন্যই সেখানে অন্য কোনো গাছও জন্মাতে পারে না। অথচ মেসকুইট গাছটা শুধু যে বেঁচেই আছে তাই না, চিরসবুজ হয়ে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছে ঝাঁকড়া এলোচুলের মতো। কাজেই গাছটার 'ট্রি অফ লাইফ' নামকরণেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। ওখানকার লোকেদের মধ্যে অবশ্য গাছটি নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। বলা হয়, ওই গাছটার ওখানেই নাকি ছিল ঐতিহাসিক 'গার্ডেন অফ এডেন'।

'মেসকুইট' গাছটি যে কেবল ৪০০ বছর ধরে একাই বেঁচে আছে, শুধু তাই না। দিব্যি বেঁচে আছে কোনো পানি ছাড়াই। গাছটা যেখানে অবস্থিত, সেখানে পানির কোনো অস্তিত্বই নেই...

আমি কেন অঙ্ক করতে ভয় পেতাম না, জানো?

বি, এম, গোলাম কিবরিয়া

আমার এ লেখা, আমার সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক, শ্রদ্ধেয় বাবু চিত্ত রঞ্জন ভৌমিক মহোদয়ের জন্য।

আমাদের স্কুল, বাইশরশি শিব সুন্দরি একাডেমি, সদরপুর, ফরিদপুর, দেশের প্রাচীন স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিষ্ঠানটি ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গৌরবময় শততম বছর অতিক্রম করল। এই স্কুলেরই অংকের শিক্ষক ছিলেন তিনি।

আমার কাছে তিনি একজন অসাধারণ শিক্ষক। আমার ছাত্রজীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কথা মনে করছি। আমার গ্রাম বাকপুরায় ফ্রি প্রাইমারি স্কুল, বাইশরশি শিব সুন্দরি একাডেমি, সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বটেই, কানাডার কার্লেটন ইউনিভার্সিটি, ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন ওন্টেরিও, দি ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়া-এর বেশ কিছু গুণী ও অসাধারণ মেধাবী শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই শিখেছি। তাঁদের আশীর্বাদ ও শিক্ষাই আমাকে আজকের অবস্থানে এনেছে। তাঁর মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় ও আমার প্রয়াত পিতা আব্দুর রহিম ভুঁইয়াও ছিলেন। যাঁদের কাছে আমি ঋণী ও চির কৃতজ্ঞ।

আমার সকল মহান গুণী ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষকদের মধ্যে বাবু চিত্ত রঞ্জন ভৌমিক আমার কাছে একটু ভিন্নতর। গণিতের শিক্ষক হিসেবে, গণিতের উপর অগাধ জ্ঞান ও এ বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর গভীর। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'আমি বুঝি না ছাত্ররা কেন অংককে কঠিন মনে করে। অংক বরং দারুণ একটা আকর্ষণীয় বিষয়।'

স্যারের প্রভাবেই অংকের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ও ভালোবাসা জন্মায়। শ্রী চিত্ত রঞ্জন ভৌমিক একজন নীতিবান ও নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ছিলেন, যিনি তাঁর সারাটা জীবন উৎসর্গ করেছেন গণিত শিক্ষা বিস্তারে। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই সময়নিষ্ঠ, আন্তরিক ও যত্নবান। স্যার দু' বেলাই প্রাইভেট পড়াতেন। আমি শুধু মাত্র এক মাস তাঁর নিকট প্রাইভেট পড়েছি, তবে তিনি প্রাইভেট পড়ার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করতেন এবং ক্লাসে বরং বেশি মনযোগী হওয়ার কথা বলতেন। প্রাইভেট শিক্ষক হিসেবে তাঁর প্রচুর সুনাম ও চাহিদা ছিল। শুধু আমাদের স্কুলই নয়, আশপাশের অন্যান্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা তার কাছে প্রাইভেট পড়তে আসত। তার কাছে পড়তে অন্তত ছয় মাস অপেক্ষা করতে হতো।

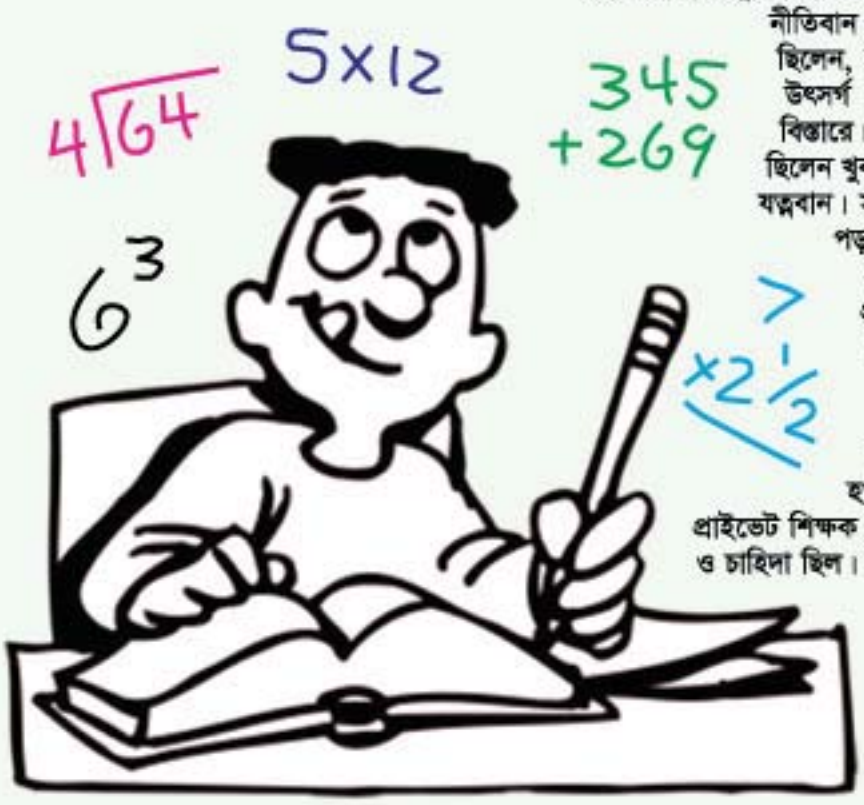

তাঁর যথাসময়ে উপস্থিতি ও সব শেষে স্কুল ত্যাগের চিরাচরিত অভ্যাসটি বোধ করি চাকরি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল।

আমি অবশ্য কয়েকবার তার পিটুনির শিকার হয়েছি, যথাযথভাবে ক্লাস অনুসরণ না করার জন্য, যা আজ আমার কাছে তাঁর বিশেষ আশীর্বাদ বলেই মনে হচ্ছে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি,তার মতন শিক্ষক যদি সমাজে আরো থাকতেন, তাহলে সমাজের চেহারা অন্যরকম হতো। তিনি শুধু একজন চমৎকার গণিত শিক্ষকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন যত্নবান অভিভাবক ও অনন্য সাধারণ, বিনয়ী ও সদাচারী মানুষ! যারা অংক ভালোবাসত না, তারাও কিন্তু স্যারকে ভালোবাসতেন ; তাঁর অসাধারণ মানসিকতার জন্যে। তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছেন ছাত্রদের অংক শেখানোর বিষয়ে সুযোগের সন্ধানে।

আসলে তাঁর সম্বন্ধে অল্প পরিসরে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর গুণগ্রাহী ও অনুগত। প্রকৃতপক্ষে আমি, তিনিসহ আমার সকল প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। তবে সবসময়ই তাদের শ্রদ্ধাভরে ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি। যাই হোক,আমি আমার খুবই প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় স্যার শ্রী যুক্ত বাবু চিত্ত রঞ্জন ভৌমিক, যাঁর আদর-শাসন, শিক্ষা ও পবিত্র সাহচর্য আমায় অংককে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, তাঁর মহান স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধের নিদর্শন স্বরূপ আমার দুইটা প্রকাশনা (publications) (co-authored) তাঁকে উৎসর্গ করেছি, যা সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। নবারুণের খুদে পাঠকদের বলছি, তোমরা বড়ো হলে ওয়েবসাইটে এই ঠিকানায় পড়ে নিতে পারবে প্রকাশনা দুটি–

http://www.m-hikari.com/.../ams-4.../ahsanullahAMS49-52-2015.pdf (page 2510)

http://www.m-hikari.com/.../ijma.../ahsanullahIJMA21-24-2015.pdf (page 1045)

এ নশ্বর পৃথিবীতে আমরা কেউই থাকব না। বিশ্বের বিভিন্ন লাইব্রেরিতে প্রকাশনা দুটি থাকবে চিরকাল। সাথে থাকবে আমার প্রিয় স্যারের নাম– শ্রী যুক্ত বাবু চিত্ত রঞ্জন ভৌমিক।

শিক্ষক, পরিসংখ্যান বিভাগের প্রধান, ফ্লোরিডা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

আকাশে ছবি আঁকা

হুমায়ূন কবীর ঢালী

আকাশে কী ছবি আঁকার শিল্পী থাকে
শিল্পীরা সব সেথায় বসে ছবি আঁকে?
হাশেম খান আর ধ্রুব এষের তুলির আঁচড়
যেদিকে তাকাই ফুটে আছে রং সাদা ঘর
হরিণ কেমন ছুটে বেড়ায় ডাগর চোখে
হাতির শুড়ে পানি ছিটোয় মেঘলোকে
কাশেম মাঝির বুড়ো বাবার চশমা ছাড়া
যাচ্ছে দেখা ধু-ধু প্রান্তর নজরকাড়া।
মেঘনা পাড়ের কাশবনেরই আরেক ছায়া
কে এঁকেছে এমন করে দিয়ে মায়া!

এমনি অনেক ছবির পাথার আকাশ মাঝে
এই শরতে, অন্যসময় সকাল– সাঁঝে।

শিউলি ফোটা ভোর

জ্যোৎস্নালিপি

কাশবনের মাঝ দিয়ে দুরন্ত ছুটে চলে ওরা। সাদা কাশফুলের ঘ্রাণের মুগ্ধতায় তিন ভাইবোন ছোটে এক অনাবিল আনন্দে। বাতাসের দোলায় দোলায়িত প্রিয়ন্তীর রুক্ষ চুল উড়ে উড়ে যায়। সামনে প্রিয়ন্তী এরপর নিলয়, শেষে প্রজাপতি। ওরা প্রজাপতির মতোই পাখা মেলে চলে। দূরের আকাশের মেঘ বোনেরা উড়ে উড়ে যায় ওদের সঙ্গে সঙ্গে। নিলয় তার ছোট্ট হাত দিয়ে প্রিয়ন্তী আর প্রজাপতিকে মেঘ বোনেদের দেখায়। সাদা শুভ্র মেঘ বোনেরা ওদেরকে মুগ্ধ করে। ওরা দু'বোন মেঘ হয়ে উড়ে উড়ে বেড়াতে চায় দূর আকাশের বুকে। নিলয় মেঘ হতে চায় না, সে হতে চায় মধ্য আকাশের তারা। প্রিয়ন্তীর হাতে একটি ময়ূরের পালক। সেটা পূজা উপলক্ষ্যে সে পেয়েছে তার ছোটো মামার কাছ থেকে। পরনে মায়ের দর্জির দোকান থেকে নতুন বানিয়ে আনা পেটিকোট। বেশ খানিকটা বড়ো, তাই মা গুঁজে গুঁজে পরিয়ে দিয়েছে। মেঘ রৌদ্রের সঙ্গে ওরা তিন ভাইবোন লুকোচুরি খেলায় মাতে। ওদের দুরন্তপনা দুষ্টু খরগোশকেও হার মানায়। নারকেল পাতা দোল খায় সোনালি রোদের ঝিলিকে। কাশবনের ধার দিয়ে গড়াই নদীর পাড়ে গিয়ে শেষ হয় ওদের গন্তব্য। বিমল মাঝিকে ওরা অনুরোধ জানায় নৌকায় উঠবে বলে। বিমল মাঝি প্রথমে রাজি না হলেও ছোটো ছোটো তিনটি ছেলে-মেয়েকে নিরাশ করতে পারে না।

পূজাকে সামনে রেখে প্রায় প্রতিদিনই নতুন নতুন বায়না ধরে মাকে অস্থির করে তোলে প্রিয়ন্তী। নিলয়-প্রজাপতি কেউ কারো চেয়ে কম নয়। বড়ো বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়। সারাদিন বসে থেকে ওরা প্রতিমা গড়া দেখে। কারোই নড়বার নামটি পর্যন্ত নেই। প্রিয়ন্তীর ছোটোকাকা এসে তিনজনকেই

কানমলা দিয়ে ধরে নিয়ে যায়। পরদিন কানমলার ব্যথা কারোরই মনে থাকে না। আবার সেই প্রতিমা গড়া দেখা। এখন তৈরি হচ্ছে প্রতিমার মুখ। ওরা জানে সবার শেষে ছাঁচে ঢেলে মুখ গড়া হয়। তারপর সেটা অসমাপ্ত জায়গায় লাগিয়ে ষষ্ঠীর দিন দেবীর প্রাণ সঞ্চার হয়– এমনটিই তারা ঠাকুমার কাছ থেকে শুনেছে।

শরৎ এসেছে গাঁয়ের বধূর হেঁটে যাওয়ার মতো চপলা ছন্দে। নিলয় মাকে বলতে শুনেছে এবারও নদীর তীর দিয়ে সাদা কাশ ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে। পূজার আর মাত্র দুই দিন বাকি। আজ ঠাকুর রং করা হবে। রং করা, ঠাকুরের চুল লাগানো, কাপড় পরানো এসব দেখতে ওদের তিন জনেরই খুব ভালো লাগে। এরই মধ্যে নতুন জামাও এসে গেছে। মা নতুন জামা আলমারিতে তুলে রেখেছে। প্রিয়ন্তী প্রতিদিনই নতুন জামা একবার করে দেখার বায়না ধরে। প্রজাপতি প্রিয়ন্তীর কাকার মেয়ে। কাকিমা আজ প্রজাপতিকে স্নান করিয়ে তবে পূজার মণ্ডপে পাঠায়। কারণ সে জানে ওরা যদি একবার ছাড়া পায় ফেরার নামটি আর করবে না। প্রিয়ন্তীও আজ ভালো জামা পরে, কারণ রং করা দেখতে আজ অনেকেই আসবে। সকাল থেকে নিলয়ের নামটি পর্যন্ত নেই। আজ ভোরে শিউলি কুড়াতেও সে যায়নি। ওরা তিন জনে প্রতিদিন ভোরে উঠে অনেক অনেক শিউলি ফুল কুড়ায়। প্রিয়ন্তী মালা গাঁথে, নিলয় আর প্রজাপ্রতি তাকিয়ে থাকে ওর মালা গাঁথার দিকে। কখন মালা গাঁথা শেষ হবে সেই প্রত্যাশায়। শেষ হলেই ওরা তিন জনে মিলে গলায় আর হাতে শিউলি মালা জড়িয়ে পাড়াময় ঘুরে বেড়ায়। আর ওরা দু'বোন শিউলি ফুলের বোঁটার রং হাতে মেখে হাত রাঙায়। শিউলি বোঁটা শুকিয়ে মাকে দিয়ে গুঁড়ো করে পুতুলের কাপড়ের রং করে ওরা।

প্রিয়ন্তী এবার বড়ো জেঠিমার ঘরে উঁকি দেয়। জেঠিমা চুপ করে তাকে কাছে আসতে বলে। নিলয়ের অনেক জ্বর। খুব মন খারাপ হয় প্রিয়ন্তীর। প্রজাপতির কান্নাকাটিতেই সে পূজার মণ্ডপে যায়। কিন্তু একটুও মন নেই তার প্রতিমা গড়ার দিকে। শুধু মনে পড়ে নিলয়ের কথা।

কাল অষ্টমী পূজা। মা বলেছে খুব ভোরে উঠে শিউলি ফুল কুড়াতে। কারণ সবাই শিউলি ফুল কুড়াবে। প্রিয়ন্তী আর প্রজাপ্রতির দায়িত্ব পড়েছে পাঁচটি শিউলি মালা গাঁথার। এই মালা নিয়ে ওরা অষ্টমী পূজার অঞ্জলি দেবে। খুব ভোরেই ঘুম ভেঙে যায় প্রিয়ন্তীর। ও ডেকে তোলে প্রজাপ্রতিকেও। তারপর নিলয়ের ঘরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে শিউলি গাছতলায় যায়। আজ গাছ থেকে অনেক বেশি শিউলি ঝরেছে। ওরা দ্রুত শিউলি কুড়ায়। শিউলি গাছটি দুলছে আর গাছতলায় ফুলে ফুলে ছেয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি ওদের অবাক করার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা ভিতুও করে তোলে। ওদেরকে চমকে দিয়ে শিউলি গাছের পেছন থেকে হাজির হয় নিলয়। প্রিয়ন্তী আর প্রজাপ্রতির মুখে হাসি ফুটে ওঠে। ওরা সবাই এক সাথে শিউলি ফুল কুড়োয়।

শরতে

শাশ্বত ওসমান

শরতের আকাশে দেখো
মেঘের ভেলা
ধবধবে সাদা তুলো যেন
করছে খেলা।
কাশফুল পাখা মেলে
উড়ে চলে বাতাসে
হাওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়ায়
ওরা নীল আকাশে।
রাখাল বালক চড়ায় গরু
ক্ষীণকায়া নদীর তীরে
ছোট্ট ডিঙি নৌকা
ঘাটে এসে ভিড়ে।
ভোরে শিশির বিন্দু
জমে থাকে ঘাসে
শিউলি ফুলগুলো যেন
চোখ মেলে হাসে।
আমার এ বাংলা বাংলার
রূপ রস গন্ধে
ঋতু ফিরে ফিরে আসে
তার নিজস্ব ছন্দে।

হেমন্ত এল, এল রে!

ফরিদ আহমেদ হৃদয়

আমাদের দেশষড় ঋতুর দেশ। পালাক্রমে প্রতি দুই মাস পর পর একটি করে ঋতু আসে। ষড়ঋতুর মাঝে একটি ঋতু হলো হেমন্ত। এটি একটি চমৎকার ঋতু অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর লাগে প্রকৃতিতে যখন হেমন্তের আগমন হয়। মাঠে ভরা থাকে পাকা ধান আর চারদিকে মৌ মৌ গন্ধ । শিশির ভেজা ঘাস দেখা যায় সকাল বেলায়। শুরু হয় নবান্ন। শোনা যায় নবান্নের গান। হেমন্ত নিয়ে আসে শীতের আগমনী বার্তা।

সকাল হলেই দেখা যায় কুয়াশার চাদর যেন বিছিয়ে দিয়েছে জমিনের উপর, গাছের থেকে টুপটুপ করে শিশির পড়ে। দক্ষিণ দিক থেকে হাওয়া বয়। সেই হাওয়ায় মনটা জুড়িয়ে যায়।

ক্ষেতের পাকা ধান দেখে কৃষকের মনে আনন্দ আর চোখে অনেক স্বপ্ন ভেসে ওঠে। এই ধানে তাদের গোলা ভরে যাবে। নতুন চালের পিঠা বানায় কিষাণিরা। শুরু হয় কৃষাণের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসব। গান গেয়ে কৃষকরা পাকা ধান কাটে। হালের গরু দিয়ে মাড়াইয়ের কাজ শুরু হয়। ধান মাড়াইয়ের শেষে সে ধান শুকানো হয় তারপর কিষাণিরা অতি ব্যস্ত হয়ে পরে সেই ধান গোলায় তোলার জন্য। কেউবা নতুন চালের পিঠা বানায়। কোনো কোনো বাড়িতে সেই ধানের চিড়া বানায়, মুড়ি ভাজে। রাতের বেলায় শুরু হয় গানের আসর। অনেকে একত্রিত হয় সেই গান শুনতে।

কখনো পালা গান কখনো পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি , জারি-সারি কত রকম গান গেয়ে বয়াতিরা মাতিয়ে তোলে সেই আসর। হেমন্তে অনেক ফুল ফুটে যেমন- মল্লিকা, কামিনি কাশ আর শিউলি। ঝিলে-বিলে ফোটে শাপলা-শালুক। পাখির মিষ্টি মধুর কলরবে মনটা খুশিতে ভরে যায়। দূরে কোথাও থেকে ভেসে আসে রাখালিয়া বাঁশির সুর। খেজুর গাছে ঝুলতে দেখা যায় মাঠির হাড়ি।

গরুর গাড়িতে বৌ-ঝিয়েরা নাইওর যায় বাপের বাড়িতে। রাতে ঝিরি ঝিরি বাতাসে জানালার পাশে বসে হারিয়ে যায় কেউ ছেলেবেলায়। শেষ রাতে হালকা ঠান্ডা পড়ে তখন প্রয়োজন পরে পাতলা কাঁথা। হেমন্ত মনে দোলা দিয়ে যায়। হেমন্তের আগমনে বাংলাদেশের রূপ যে পালটে যায়।

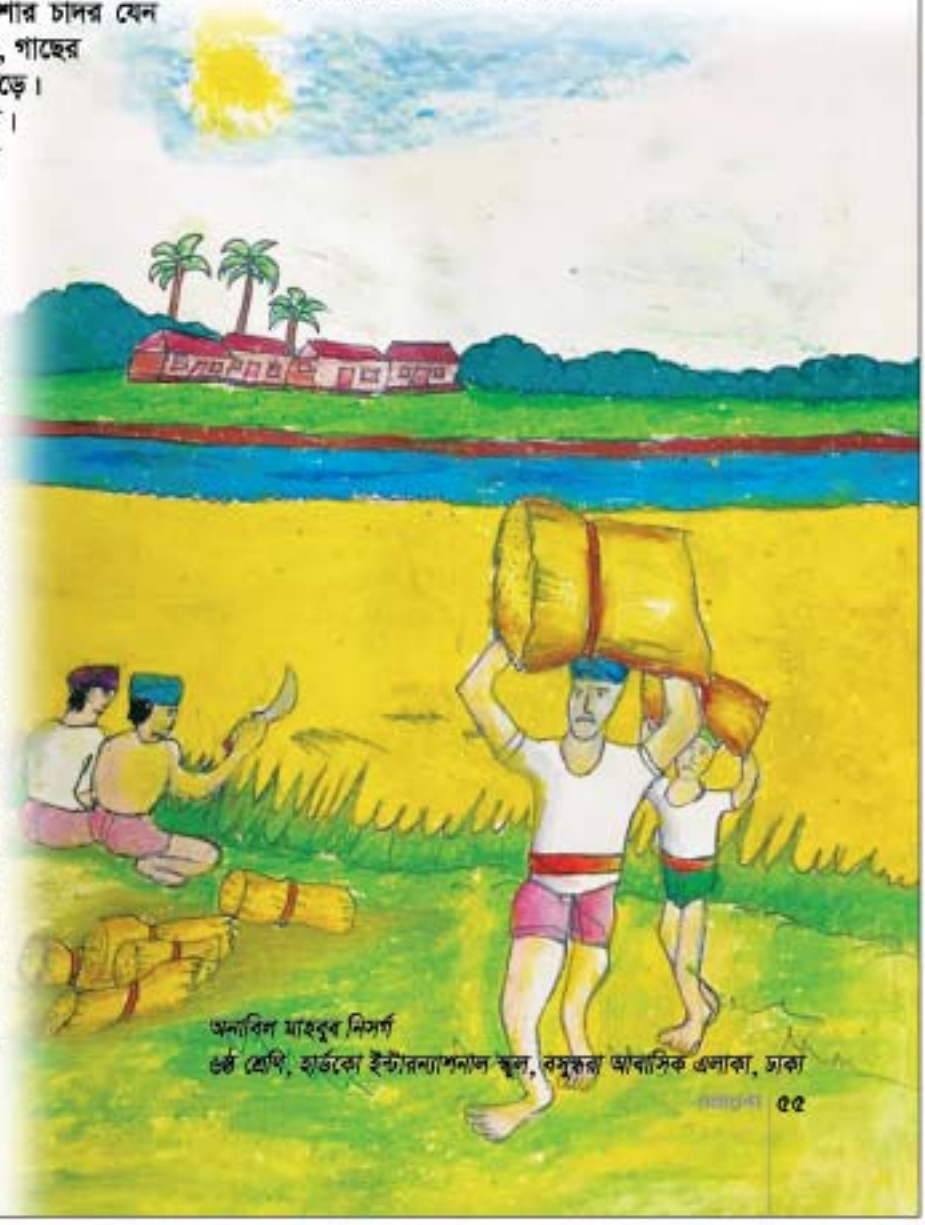

অনাবিল মাহবুব নিসর্গ
৬ষ্ঠ শ্রেণি, হার্ভেস্ট ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা

ভোর আকাশের তারা

সানাউল্লাহ্ আল-মুবীন

তুমি প্রভাতের শুকতারা
আপন পরিচয় পালটিয়ে দিয়ে
কখনো বা তুমি দেখা দাও
গোধূলির দেহলিতে
[রবীন্দ্রনাথ]

ভোররাতে ঘুম থেকে উঠে তাকাও পুব-আকাশের দিকে। শত শত তারার মাঝে উজ্জ্বল ও বড়ো একটি তারা জ্বলজ্বল করছে। তারাটা এতই উজ্জ্বল যে, মনে হবে আকাশের এই একটি তারাই যেন সমস্ত দিগন্ত আলো করে রেখেছে। এর আশ্চর্য দীপ্তিমান স্থির আলো হয়ত সরাসরি এসে পড়বে তোমার চোখে। ক্রমে আকাশ যতই ফরসা হবে, আশপাশের অন্য সব তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে। কিন্তু এই তারাটা তারপরও জ্বলজ্বল করবে, উজ্জ্বল রূপালি চাকতির মতো। এমনকি সারাদিনই তুমি একে দেখতে পাবে। অবশ্য আকাশের ঠিক কোন জায়গায় এর অবস্থান সেটা জেনে তাকাতে হবে। একে লোকে বলে শুকতারা। কখনো কখনো একে দেখা যায় সন্ধ্যেবেলা আকাশের পশ্চিমদিকে। তখন একে বলা হয় সন্ধ্যাতারা। কিন্তু এটি আসলে মোটেও তারা নয়। এ একটি গ্রহ। এর নাম শুক্রগ্রহ।

মাঝে মাঝেই শোনা যায় এমন একটি কথা, যে, আকাশে দিনের বেলা নাকি উড়ন্ত চাকি দেখতে পাওয়া যায়। উড়ন্ত চাকি নয়, আসলে ঝকঝকে নীল আকাশের পটে রূপালি চাকতির মতো চকচকে এই শুক্র গ্রহকেই দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায়ও দেখতে পাওয়া যায় বলে পূর্বোল্লিখিত কবিতায় রবীন্দ্রনাথ একে সম্বোধন করে বলেছেন: রবিরশ্মি গ্রথিত দিনরত্নের মালা/ দুলছে তোমার কণ্ঠে।

সন্ধ্যেবেলা আকাশের দক্ষিণ দিকে তাকালে হয়ত আরো একটি লাল রঙের জ্বলজ্বলে তারাকে সকলের আগে ফুটে উঠতে দেখবে। এই তারাটিও দপদপ করে জ্বলে না। অনেকটা স্থির আলো ছড়ায়। ক্রমে যতই আঁধার নেমে আসবে, সমস্ত আকাশে অন্য তারারা জ্বলে উঠলে তাদের মাঝে একে দেখাবে সবচেয়ে উজ্জ্বল। এই তারাটা কখনো দেখা দেয় পুব-আকাশে, আবার কখনো পশ্চিমাকাশে। কিন্তু আসলে এটিও কোনো তারা নয়। এ হলো সেই বিখ্যাত মঙ্গলগ্রহ, যার মানুষের কথা নিয়ে পৃথিবীর দেশে দেশে তৈরি হয়েছে নানা রহস্য আর রোমাঞ্চকর কাহিনি।

আসলে তারা আর গ্রহ মোটেও এক জিনিস নয়। এদের মধ্যে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। তারারা হলো সূর্যেরই মতো বিশাল এক-একটি আলোর গোলক। আর গ্রহগুলো হচ্ছে পৃথিবীর মতোই সৌরজগতের সদস্য। সারা বছর সূর্যের চারপাশে ঘুরে

বেড়ায় এরা। তারাদের নিজের আলো আছে। গ্রহদের নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চাঁদের গায়ে পড়ে ঠিকরে আসে। ফলে আমরা চাঁদকে আলোকিত দেখি। তেমনই গ্রহদের গায়েও সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে আসে বলে আমরা এদের দেখতে পাই। গ্রহগুলো সূর্য থেকে আলো ধার করে নেয় বলে আলো ছড়ায় স্থির দীপ্তিমান। তারাদের আলো সৃষ্টি হয় নিজের মধ্যেই। এই আলো আমাদের কাছে আসে ঝলকে ঝলকে। তাই কাঁপে দপদপ করে।

সৌরজগতে ছোটো-বড়ো মিলিয়ে গ্রহ রয়েছে আটটি। এদের মধ্যে সূর্যের সবচেয়ে কাছে রয়েছে বুধ, দূরে নেপচুন। সবচেয়ে ছোটো বুধ, বড়ো বৃহস্পতি। বুধ, মঙ্গল, শুক্র ও পৃথিবী – এই চারটি গ্রহের অবস্থান সৌরজগতের ভেতরের দিকে। এরা সূর্যের ছোটো গ্রহ। বুধ, শুক্র ও মঙ্গলকে পার্থিব গ্রহও বলা হয়। বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন দানব গ্রহ। এদের অবস্থান সৌরজগতের বাইরের দিকে। এছাড়া সৌরজগতে রয়েছে বেশ কটি অণুগ্রহ। এদের অবস্থান সৌরজগতের প্রান্তের দিকে। এ রকম একটি অণুগ্রহের নাম প্লুটো। এটি পৌনে এক শতকেরও বেশি সময় সৌরজগতের গ্রহ হয়ে ছিল। অত্যন্ত ছোটো বলে ২০০৬ সালে বিজ্ঞানীরা এর গ্রহ পদবি কেড়ে নেন।

গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে হচ্ছে শুক্র ও মঙ্গল। শুক্র সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ। এর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের চেয়ে চার কোটি কিলোমিটার ভেতরের দিকে। পৃথিবী তৃতীয় গ্রহ। মঙ্গল চতুর্থ। এর কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের চেয়ে সাত কোটি কিলোমিটার বাইরের দিকে। শুক্র ও মঙ্গলের মতো সূর্যের অন্য কোনো গ্রহ পৃথিবীর আর এত কাছাকাছি নেই বলে এদের সম্বন্ধেই আমাদের যত কৌতূহল আর আগ্রহ।

যে গ্রহ সূর্যের যত কাছে তার গতি তত দ্রুত, আর বছরও তত ছোটো। যে গ্রহ সূর্য থেকে যত দূরে, তার গতি তত কম, আর বছরও তত বড়ো। পৃথিবীতে এক বছর পূর্ণ হয় তিনশত পঁয়ষট্টি দিনে। শুক্রগ্রহ রয়েছে পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের আরো কাছে। তাই সেখানে বছর হয় আমাদের হিসাবে দুশত পঁচিশ দিনে। কিন্তু এই সময়ে তার পূর্ণ এক দিন হয় না। কারণ সে নিজের ওপর ঘোরে অতি ধীরে। তার অক্ষ-আবর্তনের কাল আমাদের দুইশত তেতাল্লিশ দিনের সমান। শুক্র যতদিনে সূর্যের চারপাশ একবার ঘুরে আসে, ততদিনে তার পক্ষে নিজ অক্ষের ওপর একবার পাক খাওয়া সম্পন্ন হয় না।

গ্রহের কক্ষপথ অর্থাৎ যে-পথে তারা সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায় সে-পথ কোনো গ্রহের ছোটো আবার কোনো গ্রহের বড়ো। কক্ষপথে কেউ ছোটে অতি দ্রুত, আবার কেউ বা চলে যথেষ্ট মন্দগমনে। তাই আকাশে আমরা সব গ্রহকে একসঙ্গে দেখতে পাই না। ঘটনাচক্রে কোনো কোনো সময় যদি শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল – কক্ষপথে এই তিনটি গ্রহই পাশাপাশি ছুটতে থাকে, তখন আকাশে আমরা শুক্র ও মঙ্গল দুটো গ্রহকেই দেখতে পাই একসঙ্গে।

ধরা যাক শুক্রগ্রহের কথা। এই গ্রহ আকারে পৃথিবীর প্রায় সমান। পৃথিবীর ব্যাস তেরো হাজার কিলোমিটারের কিছু কম। আর শুক্রের ব্যাস বারো হাজার কিলোমিটারের কিছু বেশি। এর ভরও পৃথিবীর কাছাকাছি। এসব মিলের কারণে শুক্রগ্রহকে পৃথিবীর বোন বলে ডাকা হয়। সূর্য থেকে পৃথিবী দূরে আছে পনেরো কোটি কিলোমিটার। আর শুক্রের দূরত্ব প্রায় এগারো কোটি কিলোমিটার। সূর্যের চারপাশের কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর যেখানে লাগে তিনশত পঁয়ষট্টি দিন, শুক্র সেখানে পূর্ণ একপাক দিয়ে আসে মাত্র দুইশত পঁচিশ দিনে। তাই প্রতি পাঁচশত চুরাশি দিন অর্থাৎ প্রায় উনিশ মাসে সে একবার পৃথিবীকে অতিক্রম করে যায়। এই সময় পৃথিবী, শুক্র ও সূর্য এসে পড়ে একই সরলরেখায়। বিজ্ঞানীরা এই ঘটনাকে বলেন পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের অন্তঃসংযোগ। এই সময়ের কাছাকাছি কিছুদিন পৃথিবী থেকে শুক্রকে দেখা যায় না। কারণ তখন তার দিনের অংশ বা আলোকিত দিক থাকে সূর্যের দিকে। পৃথিবীর দিকে থাকে তার রাতের অংশ বা অন্ধকার দিক। অমাবস্যায় চাঁদ যেমন ঢাকা পড়ে যায় অন্ধকারে।

শুক্র যখন একটু একটু করে সামনের দিকে সরতে থাকে, তখন একটু একটু করে প্রকাশ পায় ফালি চেহারায়। এটি সূর্য অস্ত যাওয়ার পর পশ্চিমাকাশে ফুটে ওঠে সন্ধ্যাতারা হয়ে। কক্ষপথে পৃথিবীর আগে চলতে চলতে শুক্র বড়ো হয়। বড়ো হতে হতে একসময় তার অর্ধেক শরীর প্রকাশ পায়। তখন শুক্র থাকে পৃথিবী ও সূর্যের তুলনায় সমকোণে। তারপরে শুক্র আরো সরতে সরতে গিয়ে পড়ে পৃথিবী থেকে

সূর্যের ঠিক বিপরীত দিকে। এই সময় পৃথিবী, সূর্য ও শুক্র থাকে একই সরলরেখায়। এই ঘটনাকে বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের বহিঃসংযোগ। মূলত এই সময়েই তার পুরো অংশ প্রকাশ পায়। পূর্ণিমায় চাঁদ যেমন প্রকাশ পায় তার ভরা রূপে। কিন্তু এই সময়ের কাছাকাছি কিছুদিন শুক্রকে দেখা যায় না। কারণ তখন সে থাকে সূর্যের আড়ালে, কিংবা হয়ত কিছুটা ডানে, না হয় কিছুটা বামে। আরো কিছুদিন পর শুক্র ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী ও সূর্যের তুলনায় আবার সমকোণে এসে পড়ে। প্রকাশ পায় তার অর্ধাংশ। তারপরে শুক্র আরো এগিয়ে আসতে আসতে যখন কক্ষপথে এসে পড়ে পৃথিবীর পেছনে, তখন ভোররাতে পুব-আকাশে একে আমরা দেখতে পাই শুকতারা হিসেবে।

পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের অন্তঃসংযোগ হওয়ার একমাস আগে অথবা পরে শুক্র যখন আমাদের সবচেয়ে কাছে এসে পড়ে, এবং ফালি চেহারায় প্রকাশ পায়, তখন তাকে আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা লুব্ধকের চেয়েও দশ থেকে বারো গুণ বেশি উজ্জ্বল দেখায়। তখন রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে তার আলোয় সাদা দেওয়াল বা পর্দার ওপর কোনো বড়ো গাছ অথবা জন্তু কিংবা অন্য কোনো বস্তুর ছায়াও ফেলা যেতে পারে। এমনকি বড়ো বড়ো হরফে লেখা বইও পড়া যেতে পারে। আবার যখন পৃথিবী থেকে শুক্র সবচেয়ে দূরে সরে যায় এবং প্রকাশ পায় তার পূর্ণাবয়ব, তখন দূরে থাকার কারণে তাকে সবচেয়ে অনুজ্জ্বল দেখায়। তখনও কিন্তু শুক্র লুব্ধকের চেয়েও তিন থেকে চারগুণ বেশি উজ্জ্বল। অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্যকে বাদ দিলে শুক্র সব সময়ই আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বিজ্ঞানীরা জেনেছেন, শুক্রকে ঘিরে আছে একটি গভীর ঘন গ্যাসের আবরণ। আর তাতে দুরবিনে দেখেছেন ভাসমান মেঘের সঞ্চরণ। আমরা পৃথিবী থেকে শুক্রের গা দেখতে পাই না। যা দেখতে পাই তা হচ্ছে সূর্যের আলো পড়ে উজ্জ্বল হওয়া সেই গ্যাসীয় আবরণ।

বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহের রহস্য উদ্ধার করার জন্য ইতোমধ্যেই তার দিকে বেশ কয়েকটি দূরপাল্লার গ্রহযান পাঠিয়েছেন। ১৯৬১ সালের মে মাসে সোভিয়েত গ্রহযান ভেনাস-১ প্রথম শুক্রগ্রহের প্রায় এক লাখ কিলোমিটার দূর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। পরের বছরের ডিসেম্বরে মার্কিন গ্রহযান মেরিনার-২ গিয়ে হাজির হয়েছিল শুক্রের উপরিতলের মাত্র পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোমিটারের মধ্যে। সেই গ্রহযান শুক্রের অজানা জগৎ সম্পর্কে পৃথিবীতে অনেক নতুন তথ্য পাঠিয়েছিল। এরপর ১৯৬৭ সালে শুক্রগ্রহের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছিল তৎকালীন সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের ভেনাস-৪ ও মারকিন বিজ্ঞানীদের মেরিনার-৫। মেরিনার-৫ শুক্রের উপরিতলের মাত্র চারশ কিলোমিটার দূর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে পৃথিবীতে কিছু নতুন তথ্য পাঠিয়েছিল। ১৯৬৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের আরো দুটো গ্রহযান ভেনাস-৫ ও ভেনাস-৬ – শুক্রের দেশে গিয়ে পৌঁছেছিল। দুটো গ্রহযান থেকে যন্ত্রপাতিসমেত দুটো ক্যাপসুল বা আধার নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭২ সালে আরো একটি ভেনাস যান শুক্রগ্রহে গিয়েছিল।

এরপর ১৯৭৫ সালে শুক্রগ্রহের দেশে গিয়েছিল ভেনাস-৯ ও ভেনাস-১০। দুটো গ্রহযানই অনেক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ চালিয়েছিল। পাঠিয়েছিল শুক্রের উপরিতলের আশ্চর্য স্পষ্ট ছবি। ১৯৭৮ সালে মার্কিন বিজ্ঞানীরা পাঠিয়েছিলেন পাইয়োনিয়ার-১২ নামে একটি গ্রহযান। সে বছরের ডিসেম্বরে গ্রহযানটি শুক্রের এলাকায় পৌঁছেছিল এবং একটি কৃত্রিম উপগ্রহ হয়ে প্রায় দশ বছর ধরে শুক্রকে প্রদক্ষিণ করেছিল, আর চালিয়েছিল নানা পরীক্ষার কাজ। সেই পরীক্ষা কাজের ফলে শুক্রের প্রায় পুরো উপরিতলেরই একটি নিখুঁত মানচিত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে, যাতে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় বিশাল বিশাল পাহাড়, সমতল ভূমি আর আগ্নেয়গিরির অসংখ্য জ্বালামুখ। সেই মানচিত্রেই খুঁজে পাওয়া গেছে শুক্রের সর্বোচ্চ পর্বত শিখর ম্যাক্সওয়েলের, যা কিনা আমাদের এভারেস্ট শৃঙ্গের চেয়েও বেশি উঁচু।

১৯৮২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেনাস-১৩ ও ভেনাস-১৪ নামে আরো দুটো গ্রহযান পাঠিয়েছিল শুক্রগ্রহে। এ দুটো গ্রহযান থেকে পাওয়া গিয়েছিল শুক্রের উপরিতলের প্রথম রঙিন ছবি। এসব ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছিলেন, শুক্রের উপরিতলে আছে পাথর-ছড়ানো বিস্তীর্ণ সমভূমি, আর গর্তে ভরা উঁচুনীচু জমি। সেখানে মাটির রং খয়েরি। অনেকটা আগ্নেয়গিরির জমে যাওয়া লাভার মতো। সদম্ভে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়গুলো দেখে মনে হতে পারে, এ বুঝি মধ্যপ্রাচ্যেরই কোনো অঞ্চল।

১৯৮৫ সালে পৃথিবীর আকাশে এসে হাজির হয়েছিল

ঐতিহাসিক হ্যালির ধূমকেতু। এই ধূমকেতু পর্যবেক্ষণ করার জন্য আকাশে উঠেছিল সোভিয়েত দেশের ভেগা-১ ও ভেগা-২ নামে দুটো আকাশযান। শুক্রগ্রহের পাশ ঘেঁষে উড়ে যাওয়ার সময় এরা আলত করে তার পিঠে নামিয়ে দিয়েছিল পরীক্ষার নানা যন্ত্রপাতি। এসব যন্ত্রপাতি শুক্রের রহস্য ঘেরা দেশ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল।

শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে পাঠানো পৃথিবীর সর্বশেষ যানটি হচ্ছে মার্কিন বিজ্ঞানীদের মেগেলান। ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে এটি শুক্রের দেশে গিয়ে পৌঁছোয় এবং একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মতো এর চারপাশে ঘুরতে শুরু করে। এই সময় গ্রহযানটি শুক্রের উপরিতলের মাত্র পঁচিশ কিলোমিটারের মধ্যে নেমে যায় এবং আগের তুলনায় দশ গুণ বেশি উজ্জ্বল ও একশত গুণ বেশি ভালো ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠায়।

বিজ্ঞানীরা শুক্রগ্রহকে বলেন পৃথিবীর বোন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় একে সম্বোধন করেছেন 'আমাদের সকালসন্ধ্যার সোহাগিনী' বলে। এর আকাশে পাঠানো গ্রহযানগুলোর মাধ্যমে গ্রহটির উপরিতল সম্পর্কে আমরা অনেক খবর জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রের নানা দিক থেকে মিল থাকলেও প্রচণ্ড অমিল রয়েছে এর বায়ুমণ্ডল ও অক্ষ-আবর্তনের দিক দিয়ে। শুক্রের বায়ুমণ্ডলের প্রায় সবটা আঙ্গারিক গ্যাস বললেই চলে। তবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প আছে খুব সামান্য। আর শুক্রের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় পাঁচশত ডিগ্রি সেলসিয়াস। আমাদের গৃহস্থালিতে ব্যবহৃত ওভেনের চেয়েও বেশি।

আর চাপ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপের চেয়ে প্রায় একশত গুণ বেশি। এই ভীষণ চাপে ভেনাস গ্রহযানের নামানো যন্ত্রপাতির প্রথম ক্যাপসুলটি শুক্রের মাটিতে পৌঁছার আগেই ডিমের খোসার মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর সঙ্গে শুক্রগ্রহের আর-একটি প্রধান অমিল হলো তার অক্ষ-আবর্তনে। পৃথিবী ঘোরে পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে। কিন্তু এই গ্রহটি ঘোরে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে। ফলে শুক্রের দেশে সূর্য ওঠে পশ্চিম দিকে, ডোবে পূর্ব দিকে। অবশ্য এর উপরিতল থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখা সম্ভব নয়। কারণ প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার পুরো মেঘের একটি গভীর আস্তরণ গ্রহটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে। এই মেঘের এলাকা আবার স্তরে-স্তরে বিভক্ত। ফলে শুক্রের মাটিতে কখনোই সূর্য দৃশ্যমান হয় না। কিন্তু মেঘের স্তর ভেদ করে সূর্যালোক পৌঁছে যায় তার মাটিতেও। তবে প্রতিসরণের কারণে দিনে বা রাতে আলোর মাত্রার তেমন কোনো হেরফের হয় না। ভরদুপুর কি নিশুতি রাত – শুক্রের উপরিতলে সব সময়ই আলো ও আঁধার থাকে মাখামাখি হয়ে। পৃথিবীর উষাকালের মতো। দেখতে পাওয়ার সীমা খুব বেশি দূর নয়।

শুক্রগ্রহের মাটিতে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই। কারণ এটি মেঘে-ঢাকা এক নরক। আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন বায়ুমণ্ডল যে পরিমাণ সূর্যের তাপ শোষণ করে সে পরিমাণ ছেড়ে দেয় না। ফলে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে সবুজঘর প্রতিক্রিয়া। সবুজঘরে কাচের দেওয়াল ভেদ করে সূর্যের আলো ঢোকে, কিন্তু লাল-উজানি আলোর ঢেউ বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে ক্রমশ তেতে ওঠে সবুজঘর। শীতপ্রধান দেশে সবুজঘর তৈরি করে শাকসবজির চাষ করা হয়। শুক্রগ্রহের আঙ্গারিক গ্যাসের মেঘও সবুজঘরের মতো সূর্যালোক শোষণ করে, কিন্তু লাল-উজানি আলোর ঢেউকে বেরিয়ে যেতে বাধা দেয়। তাই প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে আছে এই গ্রহ। শুক্রের এই সবুজঘর প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আঙ্গারিক গ্যাসের ঘন আবরণে গ্রহটি যেন কম্বলচাপা'। এতে শুক্র যেন হয়ে উঠেছে এক মানবী সত্তা।

বহু শত বছর ধরে শুক্রগ্রহকে পৃথিবীর বোন বলে ভাবা হয়েছে। কিন্তু শুক্রে পৃথিবীর মতো অরণ্য নেই, সমুদ্র নেই, নদী নেই, সেখানে ফুল ফোটে না, পাখি গান গায় না, নেই পৃথিবীর মতো রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি। একদিন আদিম পৃথিবী যেমন উত্তপ্ত ছিল, শুক্র হয়ত এখন আছে সেই অবস্থায়। কোটি কোটি বছর পরে শুক্রও একদিন হয়ত পৃথিবীর মতো ক্রমশ ঠান্ডা হয়ে আসবে। সেখানে হয়ত পৃথিবীর মতো প্রাণের ফুলও ফুটবে একদিন। কোনো ফাঁকে হয়ত মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে উদ্ভিদ, আকাশে মাথা তুলবে, বায়ুমণ্ডলের আঙ্গারিক গ্যাস থেকে অঙ্গার পদার্থ নিয়ে ছাড়া দিতে থাকবে অক্সিজেন গ্যাস। তারপরে একদিন হয়ত শুরু হবে জীবজন্তুর পালা। জাগবে অরণ্য, নদীতে ঢেউ খেলবে, সমুদ্র তরঙ্গায়িত হবে, তাতে মাছেরা নাচবে, পাখি সুর তুলবে গাছের ডালে, উড়ে যাবে আকাশে, অরণ্য কাঁপাবে বন্যরা। সেদিন আমরাও হয়ত জাহাজ ভিড়াবো ওদের বন্দরে।

বাংলাদেশ একটি মানবিক দেশ

বাঙালি সাহসী জাতি হিসেবে সারা বিশ্বে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই জাতি সব কিছুতেই সাহসিকতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে, বাংলাদেশ একটি মানবিক দেশও বটে। কেন নয় ? এই যে কিছুদিন আগে দেশের ২১টি জেলায় হঠাৎ এল বন্যা। ব্যাপক ক্ষতি হলো ফসলের। তখন ত্রাণ বিতরণের পাশাপাশি নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সরকার। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের ৩ মাস পর্যন্ত সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ১ কোটি মানুষকে ১০ টাকা কেজিতে চাল দেওয়া হচ্ছে। যেসব শিক্ষার্থীদের বই-খাতা বন্যায় নষ্ট হয়েছে তাদের আবার বই দেওয়া হচ্ছে। বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হচ্ছে সব ধরনের সহায়তা। এভাবে দেশের অসহায় মানুষের পাশে থেকেছে দেশ। শুধু কি তাই?

প্রতিবেশি দেশ মিয়ানমারের শাসকশ্রেণি অত্যাচার শুরু করল নিজের দেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উপর। অসহায় মানুষগুলো প্রাণ বাঁচাতে ছুটে এল বাংলাদেশে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আশ্রয় দিলেন লাখ লাখ মানুষকে। সেপ্টেম্বরের ২১ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি জাতি-ধর্ম- নির্বিশেষে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের সকল বেসামরিক নাগরিকের নিরাপত্তা রক্ষা এবং রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে আশু ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টনিও গুটেরেস সহ বিশ্বের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে শুনেছেন তাঁর কথা। দাঁড়িয়ে সম্মান দেখিয়েছেন, করতালি দিয়েছেন।

ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'মাদার অব হিউম্যানিটি' (মানবতার মা) বলে আখ্যায়িত করেছে। এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে ব্রিটেনভিত্তিক গণমাধ্যম চ্যানেল ফোর।

কেবল বড়োরা কেন, শিশুদের এবং বিশেষ শিশুদের জন্যেও বাংলাদেশ মানবিকতার দৃষ্টান্ত রেখেছে। অটিজম আক্রান্তদের নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রীর কন্যা এবং বাংলাদেশ অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সায়মা ওয়াজেদ পুতুল 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হয়েছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী মিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

আমরা শোকাহত

ফুটবল কন্যা সাবিনার হঠাৎ চলে যাওয়া

সাবিনা ইয়াসমিন। খেলার মাঠে আলো ছড়ানো একটি নাম। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ নারী ফুটবল দলের মধ্যমাঠের খেলোয়াড়। ২০১৫ এএফসি অনূর্ধ্ব-১৪ গার্লস রিজিওনাল চ্যাম্পিয়নশিপ ফুটবলে জয়ী বাংলাদেশ দলের খেলোয়াড় ছিলেন সাবিনা। গত ১৭ সেপ্টেম্বর যশোরে অনূর্ধ্ব ১৪ টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা শেষে ১৮ সেপ্টেম্বর ছুটিতে বাড়িতে আসে সাবিনা। বাড়িতে আসার পর থেকেই সে জ্বরে ভুগছিল। ২৬ সেপ্টেম্বর বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই সাবিনা চলে যান না ফেরার দেশে। কলসিন্দুরের এই ফুটবল কন্যার চলে যাওয়ার বেদনা ছুঁয়ে যায় দেশের সকলকে। সবার মতো নবারুণও এ খুদে প্রতিভার অকাল মৃত্যুতে শোকাহত।

স্বাস্থ্য

আমি দেশের মাটিতেই চিকিৎসা নেব: প্রধানমন্ত্রী

একজন মানুষ দেশকে কতটুকু ভালোবাসলে এই কথাটি বলতে পারেন। তাঁর এই কথা থেকেই বুঝতে পারি আমরা। হ্যাঁ বন্ধুরা আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথাই বলছি। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গত দেড় বছর যাবৎ দেশের হাসপাতালেই চিকিৎসা নিচ্ছেন তিনি।

দেড় বছর আগে গাজীপুরের কাশিমপুরে 'শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে

বিশেষায়িত হাসপাতাল'-এ চিকিৎসা নিতে এসে বলেছিলেন, 'আমি যদি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়ি তাহলে আপনারা আমাকে বিদেশে নেবেন না। এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ওঠাবেন না। আমি দেশের মাটিতেই চিকিৎসা নেব। এই হাসপাতালে চিকিৎসা নেব।'

গত ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর ছোটো বোন শেখ রেহানাকে নিয়ে আবার ঐ হাসপাতালে পৌঁছান। দেশের মাটিতে আর মানুষের প্রতি মায়া-মমতা-ভালোবাসার কারণে দেশের সরকার প্রধান হয়েও তিনি সাধারণ রোগীর মতো লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটেন। হাসপাতালের কাউন্টারে গিয়ে নাম নিবন্ধন করান ও চেকআপের ফি দেন। পরে হাসপাতালে চোখ, কানসহ নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তারপর রক্ত আল্ট্রাসোনোগ্রাম এবং এক্সরে করা হয়। পরীক্ষায় জানা যায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর

বন্ধুরা, শেখ রাসেলকে তোমরা সবাই চেনো। তিনি তোমাদের মতোই হেসে-খেলে বেড়ানো একজন শিশু ছিলেন। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোটো ছেলে। তাঁর জন্ম ১৯৬৪ সালের ১৮ অক্টোবর। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট একদল ঘাতক সপরিবারে বঙ্গবন্ধুসহ শিশু শেখ রাসেল-কেও হত্যা করে। তখন তার বয়স মাত্র ১১ বছর।

তোমরা ইচ্ছা করলেই তাঁর সম্পর্কে জানতে পারো। আর এজন্য তোমাদের যেতে হবে বাংলাদেশ শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে। একাডেমিতে ঢুকলেই দেখতে পাবে 'দুরন্ত' নামের একটি শিশুর ভাস্কর্য। একটু এগিয়েই পাবে দেশের একমাত্র বিশেষায়িত শিশু জাদুঘর 'শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর'। প্রথমেই চোখে পড়বে শিশু রাসেলের ভাস্কর্য। তিনতলা জাদুঘরটিতে তিনটি গ্যালারি রয়েছে। প্রথম তলায় আছে 'মৃত্যুঞ্জয়ী শেখ রাসেল' শিরোনামে গ্যালারি। এখানে মোট ৫২টি আলোকচিত্র রয়েছে। জাদুঘরের এই গ্যালারিটি ঘুরে ঘুরে দেখলে মনে হবে শেখ রাসেল যেন আমাদের আশপাশেই ঘুরঘুর করছে। জাদুঘরের অন্য দুটি গ্যালারিতে শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরা হয়েছে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

২০১৪ সালে 'শেখ রাসেল শিশু জাদুঘর' ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। নতুন রূপে, নতুন আঙ্গিকে শিশুদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করে গড়ে তোলা হচ্ছে জাদুঘরটি। রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত জাদুঘরটি সকাল ৯টা থেকে ৫টা পর্যন্ত শিশু-কিশোরদের জন্য খোলা থাকে।

তো বন্ধুরা, চলে যাও মা-বাবার সঙ্গে শিশু শেখ রাসেলকে জানতে শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে।

প্রতিবেদন : প্রসেনজিৎ কুমার দে

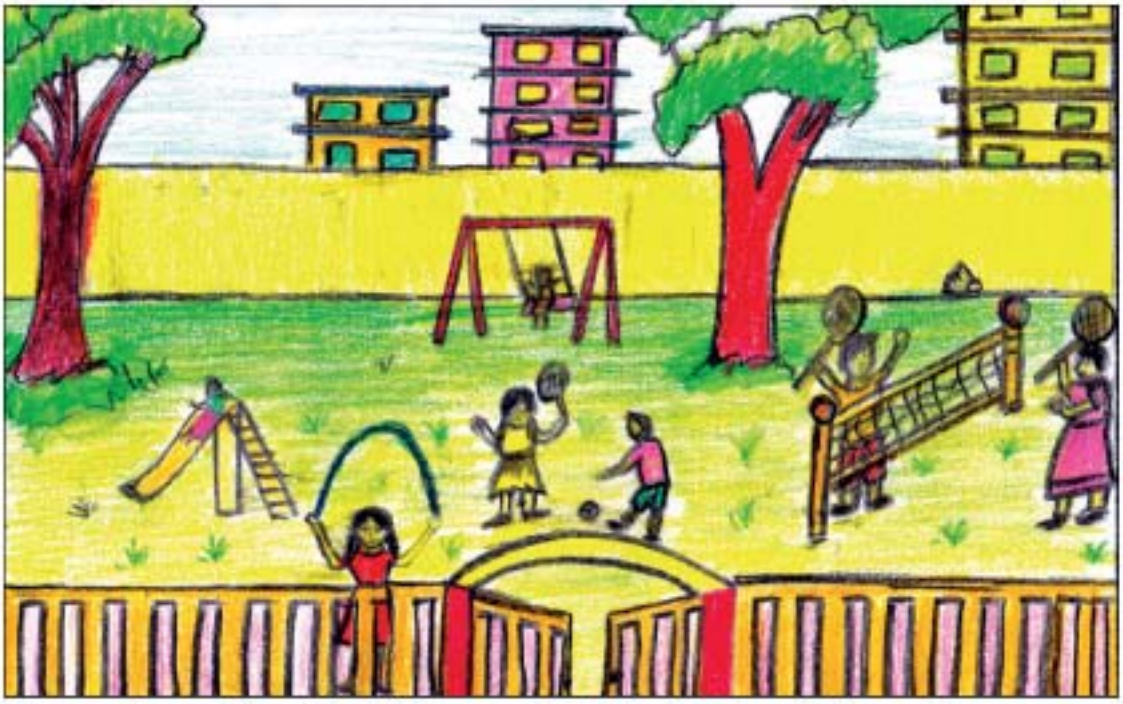

জান্নাতুল নাইমা, তৃতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা

কাজী ইসতিয়াক ইসলাম, ষষ্ঠ শ্রেণি, ধানমন্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

আফসানা আক্তার মোহনা, পঞ্চম শ্রেণি, রাইফেলস পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

তিশা বিশ্বাস, দশম শ্রেণি, নাদুড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাংশা, রাজবাড়ি

আহান ইসলাম, ২য় শ্রেণি, মাদার তেরেজা কেথলিক স্কুল, মিরপুর, ঢাকা।

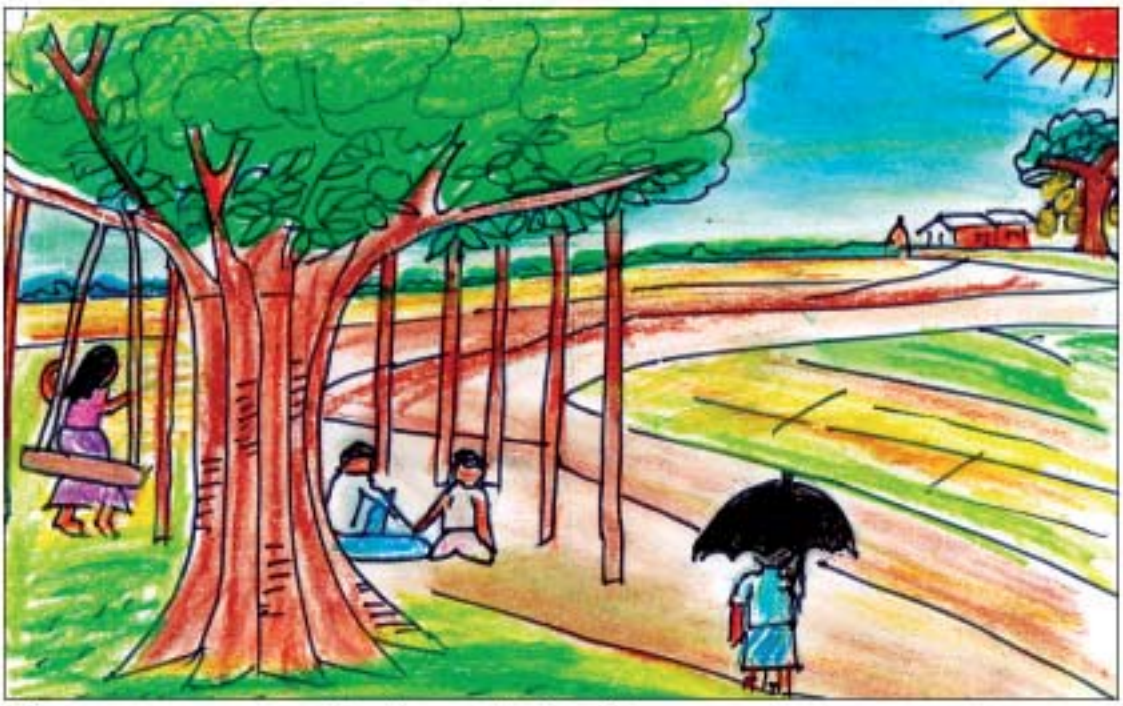

সুস্মিতা বোস শ্রেয়া, নবম শ্রেণি, হলিক্রস বালিক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ২

আশ্রয়ণ প্রকল্প

'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার'

বন্ধুরা, আমরা যারা শহরে বা গ্রামে বসবাস করি সবার-ই কাছে বাড়ি খুব ভালো লাগে তাই না? সামনে খোলা উঠোনে ছেলেরা ফুটবল, ক্রিকেট আর মেয়েরা কানামাছি, বৌ ছি কত মজার খেলাই না খেলি। আবার সবাই মিলে বাড়ির এক কোণে চড়ুইভাতি রান্না করা, গোল হয়ে বসে কলা পাতায় খেতে খেতে খুনসুঁটি করা, আরো কত কি!

আচমকা হাজির হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে আমাদের অনেক বন্ধুদের বাড়িঘর নদীর বুকে মিশে যায়, ঘরবাড়ি হারিয়ে হয়ে পড়ে ছিন্নমূল। আশ্রয় নেয় সরকারি জমি অথবা বিভিন্ন স্থাপনায়। মন মরা হয়ে ছুটে চলা বন্ধুটি আবদ্ধ হয়ে যায় অন্য আশ্রয়ে। কিন্তু তোমরা কি জানো বন্ধুরা, আমাদের এসব বন্ধুদের পাশে আছেন আমাদের প্রিয় নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙনে ছিন্নমূল অসহায় পরিবারের পুনর্বাসনে উপহার দিয়েছেন। এর নাম 'আশ্রয়ণ প্রকল্প'।

তোমরা আরো জেনে খুশি হবে, আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘূর্ণি দুর্গত মানুষের জন্য তৎকালীন নোয়াখালীর (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর) রামগতিতে 'গুচ্ছগ্রাম' গড়েছিলেন। একই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৭-এর ঘূর্ণিঝড়ে গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ গড়ে তোলেন। স্থানীয় প্রশাসন এবং সশস্ত্রবাহিনীর যৌথ সহায়তায় গড়ে উঠেছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো।

এছাড়া এ প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হলো, দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করে তোলা। আশ্রয়ণ কোনো সাহায্য প্রকল্প নয়, হতদরিদ্র মানুষের জীবন-জীবিকার ন্যায্য অধিকার আর সেটিই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জনবান্ধব সরকার ছিন্নমূল মানুষের জন্য নিশ্চিত করছে।

তাছাড়া প্রকল্প এলাকায় সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রকল্প এলাকার বাড়িগুলোকে দুর্যোগ সহনীয়ভাবে তৈরি করার পরিকল্পনাও রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পুকুর খনন করা এবং টেকসই সংযোগ সড়ক ও কালভার্ট নির্মাণ করা হবে। দুর্যোগ সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকার বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

Regd, Dha, 143-Monthly Nabarun, Vol-42, No- 4, October 2017, Tk-20.00

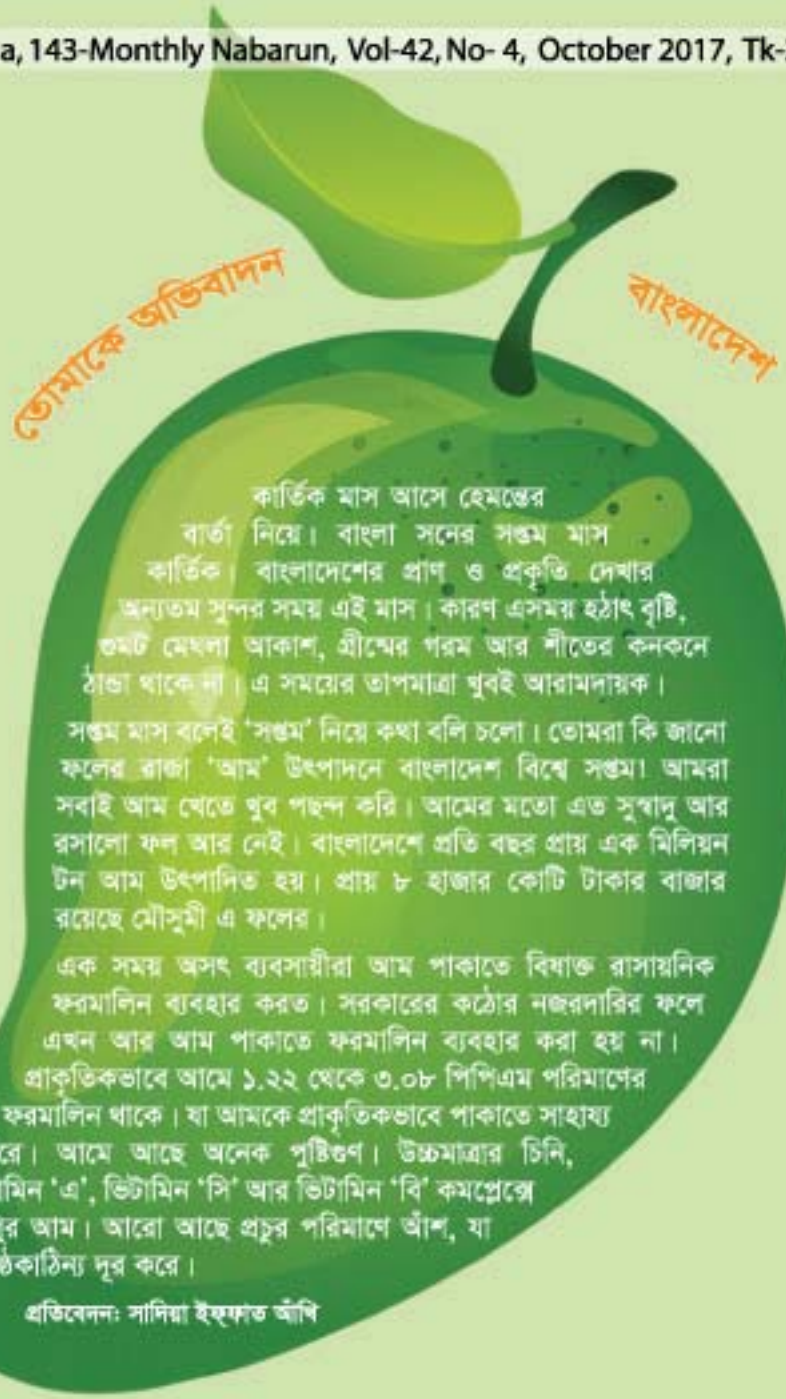

কার্তিক মাস আসে হেমন্তের বার্তা নিয়ে। বাংলা সনের সপ্তম মাস কার্তিক। বাংলাদেশের প্রাণ ও প্রকৃতি দেখার অন্যতম সুন্দর সময় এই মাস। কারণ এসময় হঠাৎ বৃষ্টি, শুভ্র মেঘলা আকাশ, গ্রীষ্মের গরম আর শীতের কনকনে ঠান্ডা থাকে না। এ সময়ের তাপমাত্রা খুবই আরামদায়ক।

সপ্তম মাস বলেই 'সপ্তম' নিয়ে কথা বলি চলো। তোমরা কি জানো ফলের রাজা 'আম' উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম। আমরা সবাই আম খেতে খুব পছন্দ করি। আমের মতো এত সুস্বাদু আর রসালো ফল আর নেই। বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়ন টন আম উৎপাদিত হয়। প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকার বাজার রয়েছে মৌসুমী এ ফলের।

এক সময় অসৎ ব্যবসায়ীরা আম পাকাতে বিষাক্ত রাসায়নিক ফরমালিন ব্যবহার করত। সরকারের কঠোর নজরদারির ফলে এখন আর আম পাকাতে ফরমালিন ব্যবহার করা হয় না। প্রাকৃতিকভাবে আমে ১.২২ থেকে ৩.০৮ পিপিএম পরিমাণের ফরমালিন থাকে। যা আমকে প্রাকৃতিকভাবে পাকাতে সাহায্য করে। আমে আছে অনেক পুষ্টিগুণ। উচ্চমাত্রার চিনি, ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি' আর ভিটামিন 'বি' কমপ্লেক্সে ভরপুর আম। আরো আছে প্রচুর পরিমাণে আঁশ, যা কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা